العَشَرَةُ المُبَشَّرَةُ بِالجَنَّةِ

আশারা মুবাশ্‌শারার জীবনকথা

[জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীর জীবনকথা]

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

চেয়ারম্যান, আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

খাদেমে বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম

Est. 1998

আল্লামা শাহ্ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

ALLAMA SHAH ABDUL JABBAR FOUNDATION

আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

আশারা মুবাশ্‌শারার জীবনকথা

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমির পক্ষে

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল-হুসাইন, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন, বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম–৪১০০

প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ: যুলহজ ১৪৪১ হি. = আগস্ট ২০২০ খ্রি.

প্রকাশনা ক্রমিক: ১৬৫, বিষয় ক্রমিক: ১০

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ: কাজী যুবাইর মাহমুদ

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

শাহ আবদুল জব্বার আশ-শরফ একাডেমী, চট্টগ্রাম

আল-মানার লাইব্রেরী, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার

বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

শাহ জব্বারিয়া লাইব্রেরী, কাঁচপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

মূল্য: ২০০ [দুই শত] টাকা মাত্র

***Ashara Mubassharaer Jeebankotha*:** By: Mohammad Abdul Hai Nadvi, Published By: Allama Shah Abdul Jabbar Foundation, Baitush Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 200 Tk

e-mail:abdulhai.nadvi@yahoo.com

www.saajbd.org

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

'সাহাবী' শব্দটি আরবি ভাষার 'সুহবত' শব্দের একটি রূপ। একবচনে 'সাহেব' ও 'সাহাবী' এবং বহুবচনে 'সাহব' ব্যবহৃত হয়। আভিধানিক অর্থ সঙ্গী, সাথী, সহচর, একসাথে জীবন যাপনকারী অথবা সাহচর্যে অবস্থানকারী। ইসলামি পরিভাষায় 'সাহাবা' শব্দটি দ্বারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মহান সঙ্গী-সাথীদের বোঝায়। 'সাহেব' শব্দটির বহুবচনের আরও কয়েকটি রূপ আছে। তবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গী-সাথীদের বোঝানোর জন্য 'সাহেব'-এর বহুবচনে 'সাহাবা' ছাড়া 'আসহাব' ও 'সাহব'ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.) *আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস সাহাবা* গ্রন্থে সাহাবীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

إِنَّ الصَّحَابِيَّ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ.

'সাহাবী সেই ব্যক্তি যিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান সহকারে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের ওপরই মৃত্যুবরণ করেছেন।'[১]

উপর্যুক্ত সংজ্ঞায় সাহাবী হওয়ার জন্য তিনটি শর্তারোপ করা হয়েছে। যথা–

১. রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান,
২. ঈমানের অবস্থায় তাঁর সাথে সাক্ষাৎ (আল-লিকা) ও
৩. ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ (মাওত আলাল ইসলাম)।

প্রথম শর্তটি দ্বারা এমন লোক সাহাবী বলে গণ্য হবে না যারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাৎ তো লাভ করেছে কিন্তু ঈমান আনেনি। যেমন– আবু জাহল, আবু লাহাব প্রমুখ মক্কার কাফিরবৃন্দ।

দ্বিতীয় শর্ত অর্থাৎ সাক্ষাৎ দ্বারা এমন ব্যক্তিও সাহাবী বলে গণ্য হবেন, যিনি হুযুরের তো সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, কিন্তু অন্ধত্ব বা এ জাতীয় কোনো

[১] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ১, পৃ. ১৫৮

অক্ষমতার কারণে চোখে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যেমন– অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযি.)।

তৃতীয় শর্ত অর্থাৎ মাউত আলাল ইসলাম দ্বারা এমন লোকও সাহাবায়ে কেরামের দলে শামিল হবেন যাঁরা ঈমান অবস্থায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হয়েছেন। তারপর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়েছেন। তারপর আবার ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হিসেবে মৃত্যুবরণ করেছেন। পুনরায় ইসলাম গ্রহণের পর নতুন করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ না করলেও তিনি সাহাবী বলে গণ্য হবেন। এটিই সর্বাধিক সঠিক মত। যেমন– হযরত আশয়াস ইবনে কায়েস (রাযি.) ও আরও অনেকে। হাদীস বিশারদগণ হযরত আশয়াস ইবনে কায়েস (রাযি.)-কে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে গণ্য করে তাঁর বর্ণিত হাদীস সহীহ ও মুসনদ গ্রন্থসমূহে সংকলন করেছেন। অথচ তিনি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যান এবং হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর খিলাফতকালে আবার ইসলামে ফিরে আসেন।

শেষোক্ত শর্তের ভিত্তিতে এমন ব্যক্তি সাহাবী বলে গণ্য হবে না যে ইসলামের অবস্থায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছে, কিন্তু পরে মুরতাদ অবস্থায় মারা গেছে। যেমন– আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আল-আসাদী। সে মুসলমান হয়ে হাবশায় হিজরত করার পর খ্রিস্টান হয়ে যায় এবং সেখানে মুরতাদ অবস্থায় মারা যায়। তাছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে খাতাল, রাবীয়া ইবনে উমাইয়া প্রমুখ মুরতাদ ব্যক্তিবর্গ। সাহাবী হওয়ার জন্য ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ শর্তটি উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, ঈমান সহকারে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সাক্ষাতের পর তাঁর সাহচর্য বেশি বা অল্পদিনের জন্য হোক, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করুক বা না করুক, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে কোনো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করুক বা না করুক, এমন কি যে ব্যক্তির জীবনে মুহূর্তের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ ঘটেছে এবং ঈমানের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, এমন সকলেই সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত।

যারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনেনি, কিন্তু পূর্ববর্তী অন্য কোনো নবীর প্রতি ঈমান সহকারে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছে তারা সাহাবী নয়। আর বুহাইরা রাহিবের মতো যাঁরা পূর্ববর্তী কোনো নবীর প্রতি ঈমান সহকারে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নুবুওয়াত লাভের পূর্বে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং বিশ্বাস করেছেন, তিনি ভবিষ্যতে নবী হবেন এমন

ব্যক্তিদের সাহাবা হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। মুসলিম মনীষীরা তাঁদের সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতে পারেননি।

উল্লিখিত সংজ্ঞার শর্তাবলি জিনদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। জিনরাও 'সাহাবা' ছিলেন। কুরআন মজিদে এমন কিছু জিনের কথা বলা হয়েছে যাঁরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কুরআন তিলাওয়াত শুনে ঈমান এনেছিলেন। নিঃসন্দেহে তারা অতি মর্যাদাবান সাহাবা ছিলেন।

সাহাবীর উল্লিখিত সংজ্ঞাটি ইমাম বুখারী (রহ.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.)সহ অধিকাংশ ইমামের নিকট সর্বাধিক সঠিক বলে বিবেচিত। অবশ্য সাহাবীর সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আরও কয়েকটি অপ্রসিদ্ধ মতামতও আছে। যেমন– কেউ কেউ সাক্ষাতের (আল-লিকা) স্থলে চোখে দেখার (রুইয়াত) শর্তারোপ করেছেন। কিন্তু তাতে এমন সব ব্যক্তি বাদ পড়ে যাবেন যাঁরা মুমিন হওয়া সত্ত্বেও অন্ধত্বের কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে চোখে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যেমন– আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযি.)। অথচ তিনি অতি মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন।[১]

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.) বলেন,

الصَّحَابِيُّ مَنْ أَقَامَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، وَغَزَا مَعَهُ غَزْوَةً أَوْ غَزْوَتَيْنِ.

'সাহাবী হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, এক বা দু'বছর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য অথবা তাঁর সাথে দু'একটি গাযওয়া বা যুদ্ধে অংশগ্রহণ।'[২]

কিছুসংখ্যক ওলামায়ে উসুল ও ওলামায়ে ইলমুল কালামের মতে, সাহাবী হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দীর্ঘ সাহচর্য ও সুন্নাতে নববী (সা.)-এর অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁর পরিচিতি ও খ্যাতি। কেউ কেউ আবার বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। একদল আলেমের মতে, যে ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর এক নজর রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছেন তিনি

[১] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ১, পৃ. ১৫৯

[২] (ক) আল-খতীবুল বাগদাদী, *আল-কিফায়া ফী মা'রিফাতি উসূলি 'ইলমির রিওয়ায়া*, পৃ. ৫০; (খ) আন-নাওয়াওয়ী, *আত-তাকরীব ওয়াত তায়সীর লি-মা'রিফাতি সুনানিল বশীর আন-নাযীর ফী উসূলিল হাদীস*, পৃ. ৯২; (গ) ইবনে জামাআ, *আল-মানহালুর রাওয়ী ফী মুখতাসারি উলূমিল হাদীস আন-নাওয়াওয়ী*, পৃ. ১১১; (ঘ) আস-সুয়ুতী, *তাদরীবুর রাওয়ী ফী শরহি তাকরীবিন নাওয়াওয়ী*, খ. ২, পৃ. ৬৭০; (ঙ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ১, পৃ. ৮

সাহাবী। আর যিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছেন, তিনিও সাহাবী। তবে এ হিসেবে যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে দেখেছেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে দেখেছেন সে হিসেবে নয়। কিন্তু হাদীস বর্ণনার দিক দিয়ে এমন ব্যক্তি সাহাবী নন, বরং তাবেয়ীর মর্যাদা লাভ করবেন।

প্রশ্ন হতে পারে, যদি কেউ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতিকালের পর দাফনের পূর্বে তাকে দেখে থাকেন, যেমনটি ঘটেছিল প্রখ্যাত আরবি কবি আবু জুয়ারিব আল-হুজালীর ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত হবে? আলেমদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। তবে গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, এমন ব্যক্তি সাহাবায়ে কেরামের দলভুক্ত হবেন না।

ইসলামি বিশেষজ্ঞগণ এ ব্যাপারে একমত যে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য বা 'সুহবত' এমন একটি মর্যাদা, যার সমকক্ষ আর কোনো মর্যাদা মুসলমানদের জন্য নেই। সুহবতের মর্যাদা ছাড়াও দীনের ভিত্তিকে শক্তিশালী ও মজবুত করা, ইসলামের তাবলীগ ও শরীয়তের খেদমতের ক্ষেত্রে কঠোর শ্রমদান ও আত্মত্যাগের কারণে প্রতিটি মুসলমানের কাছে সাহাবায়ে কেরামের একটি পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদা আছে। এ কারণে কোনো কোনো আলেমের মতে, সাহাবায়ে কেরামকে হেয়প্রতিপন্নকারী ব্যক্তি যিন্দীক। আবার কারো মতে, এটা একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

সাহাবায়ে কেরামের পরস্পরের মধ্যে মর্যাদা হিসেবে স্তরভেদ থাকতে পারে, কিন্তু পরবর্তী যুগের কোনো মুসলমানই তা তিনি যত বড় জ্ঞানী, গুণী ও সাধক হোন না কেন কেউই একজন সাধারণ সাহাবীর মর্যাদাও লাভ করতে পারেন না। এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা একমত।

এ সাহাবীরাই আল্লাহর রাসুল (সা.) ও তাঁর উম্মতের মধ্যে প্রথম মধ্যসূত্র। পরবর্তী উম্মত আল্লাহর কালাম পবিত্র কুরআন, কুরআনের ব্যাখ্যা, আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর পরিচয়, তাঁর শিক্ষা, আদর্শ, মোটকথা দীনের সবকিছুই একমাত্র তাঁদেরই সূত্রে, তাঁদেরই মাধ্যমে জানতে পেরেছে। সুতরাং এ প্রথম সূত্র উপেক্ষা করলে, বাদ দিলে অথবা তাঁদের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি হলে দীনের মূল ভিত্তিই ধসে পড়ে। কুরআন ও হাদীসের প্রতি অবিশ্বাস দানা বেঁধে ওঠে।

হাফিয ইবনে আবদুল বারর (রহ.) সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুহবত ও তাঁর সুন্নাতের হিফাযত ও ইশায়াতের দুর্লভ মর্যাদা আল্লাহ তাআলা এসব মহান ব্যক্তির ভাগ্যে লিখে রেখেছিলেন। এ কারণেই তাঁরা খায়রুল কুরুন ও খায়রু উম্মাতির মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন।'[১]

হাফিয খতীব আবু বকর আল-বাগদাদী (রহ.) বলেন,

وَالْأَخْبَارُ فِيْ هَذَا الْـمَعْنَىٰ تَتَّسِعُ، وَكُلُّهَا مُطَابِقَةٌ لِّمَا وَرَدَ فِيْ نَصِّ الْقُرْآنِ، وَجَمِيْعُ ذَلِكَ يَقْتَضِيْ طَهَارَةَ الصَّحَابَةِ، وَالْقَطْعَ عَلَىٰ تَعْدِيْلِهِمْ وَنَزَاهَتِهِمْ، فَلاَ يَحْتَاجُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ مَّعَ تَعْدِيْلِ اللهِ تَعَالَىٰ لَـهُمُ الْـمُطَّلِعِ عَلَىٰ بَوَاطِنِهِمْ إِلَىٰ تَعْدِيْلِ أَحَدٍ مِّنَ الْـخَلْقِ لَـهُمْ، فَهُمْ عَلَىٰ هَذِهِ الصِّفَةِ إِلَّا أَنْ يَثْبُتَ عَلَىٰ أَحَدٍ ارْتِكَابُ مَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا قَصْدَ الْـمَعْصِيَةِ، وَالْـخُرُوْجِ مِنْ بَابِ التَّأْوِيْلِ، فَيُحْكَمُ بِسُقُوْطِ الْعَدَالَةِ، وَقَدْ بَرَّأَهُمُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ ذَلِكَ، وَرَفَعَ أَقْدَارَهُمْ عَنْهُ، عَلَىٰ أَنَّهُ لَوْ لَـمْ يَرِدْ مِنَ اللهِ ﷻ وَرَسُوْلِهِ فِيهِمْ شَيْءٌ مِّمَّا ذَكَرْنَاهُ لَأَوْجَبَتِ الْـحَالُ الَّتِيْ كَانُوْا عَلَيْهَا، مِنَ الْـهِجْرَةِ، وَالْـجِهَادِ، وَالنُّصْرَةِ، وَبَذْلِ الْـمُهَجِ وَالْأَمْوَالِ، وَقَتْلِ الْآبَاءِ وَالْأَوْلاَدِ، وَالْـمُنَاصَحَةِ فِي الدِّيْنِ، وَقُوَّةِ الإِيْمَانِ وَالْيَقِيْنِ – الْقَطْعَ عَلَىٰ عَدَالَتِهِمْ وَالْاعْتِقَادَ لِنَزَاهَتِهِمْ، وَأَنَّهُمْ أَفْضَلُ مِنْ جَمِيْعِ الْـمُعَدَّلِيْنَ وَالْـمُزَكَّيْنَ الَّذِيْنَ يَجِيْؤُنَ مِنْ بَعْدِهِمْ أَبَدَ الْآبِدِيْنَ.

'উল্লিখিত ভাব ও বিষয়ের হাদীস ও আখবারের সংখ্যা অনেক এবং সবই নাসসুল কুরআনের ভাবের সাথে সংগতিপূর্ণ। অর্থাৎ তাতে সাহাবায়ে কেরামের সুমহান মর্যাদা, আদালত, পবিত্রতা ইত্যাদি ভাব ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ ও রাসুল (সা.) কর্তৃক তাঁদের আদালতের ঘোষণা দানের পর পৃথিবীর আর কোনো মানুষের সনদের মুখোপেক্ষী তাঁরা নন। আল্লাহ ও রাসুল (সা.) তাঁদের সম্পর্কে কোনো ঘোষণা না দিলেও তাঁদের হিজরত, জিহাদ, সাহায্য, আল্লাহর রাহে ধন-সম্পদ ব্যয়, পিতা ও সন্তানদের হত্যা, দীনের ব্যাপারে উপদেশ, ঈমান ও ইয়াকীনের দৃঢ়তা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড একথা প্রমাণ করতো যে, আদালত, বিশ্বাস, পবিত্রতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত ন্যায়পরায়ণ ও পবিত্র ব্যক্তিই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাঁরা ছিলেন সকলের থেকে উত্তম।'[১]

[১] ইবনে আবদুল বার্‌র, *আল-ইসতিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব*, খ. ১, পৃ. ১

কোনো কোনো সাহাবীর জীবদ্দশায় রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তবে মুসলিম পণ্ডিতদের অনেকে সাহাবায়ে কেরামের সকলেই জান্নাতী বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.) *আল-ইসাবা* গ্রন্থে স্পেনের ইমাম ইবনে হাযাম আল-আন্দালুসী (রহ.)-এর মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেন,

الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْـجَنَّةِ قَطْعًا.

'সাহাবায়ে কেরামের সকলেই নিশ্চিতভাবে জান্নাতী।'[২]

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সাহাবায়ে কেরামের গালি দেওয়া বা হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে সমালোচনা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

«اللهَ اللهَ فِيْ أَصْـحَابِيْ، لَا تَتَّخِـذُوْهُمْ غَرَضًـا بَعْـدِيْ، فَمَـنْ أَحَـبَّهُمْ فَبِحُبِّـيْ أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ أَبْغَضَهُمْ».

'আল্লাহ, আল্লাহ! আমার পরে তোমরা তাদেরকে সমালোচনার লক্ষ্যে পরিণত করো না। তাদেরকে যারা ভালবাসে, আমার মুহাব্বতের খাতিরেই তাঁরা ভালবাসে, আর যারা তাঁদেরকে হিংসা করে, আমার প্রতি হিংসার কারণেই তারা তা করে।'[৩]

সাহাবী চেনার উপায়

প্রশ্ন হতে পারে, কে সাহাবী এবং কে সাহাবী নয় তা কিভাবে নির্ণয় করতে হবে? রিজাল ও হাদীসশাস্ত্র বিশারদগণ এ ব্যাপারে কতিপয় মূলনীতির অনুসরণ করেছেন:

[১] (ক) আল-খতীবুল বাগদাদী, *আল-কিফায়া ফী মা'রিফাতি উসূলি 'ইলমির রিওয়ায়া*, পৃ. ৪৯; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ১, পৃ. ১৩১–১৩২

[২] (ক) ইবনে হাযম, *আল-ফাসাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল*, খ. ৪, পৃ. ১১৬; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ১, পৃ. ১৬৩

[৩] (ক) আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান*, খ. ৫, পৃ. ৬৯৬, হাদীস: ৩৮৬২; (খ) ইবনে হিব্বান, *আস-সহীহ = আল-ইহসান ফী তকরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান*, খ. ১৬, পৃ. ২৪৪, হাদীস: ৭২৫৬; (গ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ১, পৃ. ১৬৩, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল (রাযি.) থেকে বর্ণিত

১. খবরে তাওয়াতুর অর্থাৎ একজন মানুষ সম্পর্কে যখন প্রতিটি যুগের অসংখ্য মানুষ বর্ণনা বা সাক্ষ্য দেবে যে তিনি সাহাবী ছিলেন।
২. খবরে মাশহুর অর্থাৎ প্রতিটি যুগের প্রচুরসংখ্যক মানুষ সাক্ষ্য দেবে যে, অমুক সাহাবী।
৩. কোনো একজন সাহাবীর বর্ণনা বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে।
৪. কোনো একজন প্রখ্যাত তাবেয়ীর বর্ণনা বা সাক্ষ্যের ভিত্তিতে।
৫. কেউ নিজেই যদি দাবি করেন, আমি সাহাবী। সে ক্ষেত্রে দুটি বৈশিষ্ট্য তাঁর মধ্যে আছে কিনা তা দেখতে হবে। যথা–
   ১. **আদালত বা ন্যায়নিষ্ঠতা:** এটি সাহাবায়ে কেরামের বিশেষ গুণ। সাহাবিয়াতের দাবিদার ব্যক্তির মধ্যে এ গুণটি অবশ্যই থাকতে হবে।
   ২. **মু'আসিরাত বা সমসাময়িকতা:** সাহাবায়ে কেরামের যুগ শেষ হয়েছে হিজরী ১১০ সনে। কারণ রাসুল (সা.) তাঁর ইনতিকালের একমাস পূর্বে বলেছিলেন,

   «أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ عَلَىٰ رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِّنْهَا، لَا يَبْقَىٰ عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَيْهَا أَحَدٌ».

   'আজ এ পৃথিবীতে যারা জীবিত আছে আজ থেকে একশ' বছর পর তারা কেউ জীবিত থাকবে না।'[১]

সুতরাং হিজরী ১১০ সনের পর কেউ জীবিত থাকলে এবং সে সাহাবী বলে দাবি করলে রিজালশাস্ত্র বিশারদরা তাকে সাহাবী বলে মেনে নেননি। অনেকে এমন দাবি করেছিলেন; কিন্তু সে দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। তাদের জীবনীও রিজালশাস্ত্রে লিখিত আছে। এছাড়াও সাহাবী নির্ধারণের আরও কিছু নিয়ম-নীতি মুহাদ্দিসগণ অনুসরণ করেছেন।

সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা

সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা যে কত তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। ইমাম আবু যার'আ আর-রাযী (রহ.) বলেছেন,

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ১, পৃ. ৩৪, হাদীস: ১১৬; (খ) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৯৬৫, হাদীস: ২৫৩৭; (গ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ১, পৃ. ১৬০, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত

تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَنْ رَآهُ وَسَمِعَ مِنْهُ زِيَادَةٌ عَلَىٰ مِائَةِ أَلْفِ إِنْسَانٍ مِّنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ، كُلُّهُمْ قَدْ رَوَىٰ عَنْهُ سَمَاعًا أَوْ رُؤْيَةً.

'রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন ইনতিকাল করেন, তখন যারা তাঁকে দেখেছেন এবং তাঁর কথা শুনেছেন এমন লোকের সংখ্যা নারী-পুরুষ মিলে এক লাখেরও ওপরে। তাঁদের প্রত্যেকেই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন।'[১]

তাহলে যে সকল সাহাবী কোনো হাদীস বর্ণনা করেননি তাঁদের সংখ্যা যে কত বিপুল তা সহজেই অনুমেয়। ইমাম আবু যার'আ (রহ.)-এর একথার সমর্থন পাওয়া যায় *সহীহ আল-বুখারী* ও *মুসলিমে* বর্ণিত হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রাযি.)-এর একটি বক্তব্য দ্বারা। তিনি তাবুক অভিযান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

وَالنَّاسُ كَثِيرٌ، لَا يُحْصِيهِمْ دِيوَانٌ.

'মানুষের সংখ্যা অনেক। কোনো দফতর বা দিওয়ান তা গণনা করতে পারবে না।'[২]

সাহাবায়ে কেরামের যথাযথ হিসেব কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের শেষ দিকে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর হাতে বায়আত হয়। কেউ কেউ বলেছেন, হিজরী দশম সনে মক্কা এবং তায়েফে একজনও অমুসলিম ছিল না। সকলে ইসলাম গ্রহণ করে বিদায় হজে অংশগ্রহণ করে। এমনিভাবে আরবের বহু গোত্র সম্পূর্ণভাবে মুসলমান হয়ে যায়। তাদের অধিকাংশ ছিল মরুবাসী। তাদের হিসেব সংরক্ষণ করা কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। তাছাড়া হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর খিলাফতকালে ভণ্ড নবী ও ধর্মদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযানকালে অসংখ্য সাহাবী শাহাদত বরণ করেন। তাঁদের অনেকের পরিচয় ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।[৩]

পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াত ও অসংখ্য হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আয়াতের অর্থ উদ্ধৃত হলো:

[১] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ১, পৃ. ১৫৪

[২] (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ২১২৯, হাদীস: ২৭৬৯; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ১, পৃ. ১৫৫

[৩] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ১, পৃ. ১৫৫

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۚۖ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚۖ

‘মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল; তাঁর সহচরগণ, কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাঁদেরকে রুকু ও সাজদায় অবনত দেখবে। তাঁদের মুখমণ্ডলে সাজদার চিহ্ন থাকবে, তাওরাতে তাঁদের বর্ণনা এরূপই এবং ইনজীলেও।’[১]

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ ۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

‘মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাতে সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত করেছেন জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। এটা মহা কামিয়াবি।’[২]

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّاۤ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚۖ

‘এ সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যাঁরা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হতে উৎখাত হয়েছে। তাঁরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাহায্য করে। তারাই তো সত্যাশ্রয়ী। মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা এ নগরীতে (মদীনা) বসবাস করেছে ও ঈমান এনেছে তাঁরা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না, আর তাঁরা তাঁদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।’[৩]

[১] আল-কুরআন, ***সুরা আল-ফাতহ***, ৪৮:২৯
[২] আল-কুরআন, ***সুরা আত-তাওবা***, ৯:১০০
[৩] আল-কুরআন, ***সুরা আল-হাশর***, ৫৯:৮–৯

এ আয়াতে প্রথম মুহাজির ও পরে আনসারদের প্রশংসা করা হয়েছে। এভাবে সুরা আল-ফাতহের ১৮, সুরা আল-ওয়াকিয়ার ১০ ও সুরা আল-আনফালের ৬৪ নাম্বার আয়াতসহ বিভিন্ন আয়াতে কোথাও প্রত্যক্ষ আবার কোথাও পরোক্ষভাবে সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা এসেছে।

অনুরূপভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজেও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের শানে বক্তব্য রেখেছেন। তাঁদের সম্মান, মর্যাদা ও স্থান নির্ধারণ করে ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন–

عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «خَيْرُ أُمَّتِيْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ أَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ وَيَشْهَدُوْنَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوْا».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা। তারপর তার পরের যুগের লোকেরা, তারপর তার পরের যুগের লোকেরা। তারপর এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে যাদের কসম হবে তাদের সাক্ষ্যের অগ্রগামী। তাদের কাছে সাক্ষী চাওয়ার আগেই তারা সাক্ষ্য দেবে।’’[১]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ، ذَهَبًا مَّا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيْفَهُ».

‘হযরত আবু সায়ীদ আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা আমার সাহাবায়ে কেরামকে গালি দেবে না, কসম সেই সত্তার যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও ব্যয় করো তবুও তাঁদের যেকোনো একজনের মুদ বা তার অর্ধেক পরিমাণ যবের সমতুল্য হবে না।’’[২]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَهْمَا أُوْتِيْتُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ

[১] (ক) আবু দাউদ আত-তায়ালিসী, ***আল-মুসনদ***, খ. ১, পৃ. ২৩৯, হাদীস: ২৯৭; (খ) আবু আওয়ানা, ***আল-মুসতাখরাজ***, খ. ১৯, পৃ. ২৪৩, হাদীস: ১১০৫৩
[২] (ক) আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, ৫, পৃ. ৮, হাদীস: ৩৬৭৩, হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাযি.) থেকে বর্ণিত; (খ) মুসলিম, ***আস-সহীহ***, খ. ৪, পৃ. ১৯৬৭, হাদীস: ২৫৪০, হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত; (গ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ***আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা***, খ. ১, পৃ. ১৬৫

فَالْعَمَلُ بِهِ ، لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِيْ تَرْكِهِ، فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللهِ، فَسُنَّةٌ مِنِّيْ مَاضِيَةٌ، فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ سُنَّتِيْ، فَمَا قَالَ أَصْحَابِيْ، إِنَّ أَصْحَابِيْ بِمَنْزِلَةِ النُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ فَأَيُّمَا أَخَذْتُمْ بِهِ اهْتَدَيْتُمْ، وَاخْتِلَافُ أَصْحَابِيْ لَكُمْ رَحْمَةٌ».

‘হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাবের যা কিছু দেওয়া হয়েছে তার ওপর আমল করতে হবে। তা তরক করা সম্পর্কে তোমাদের কারো কোনো ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি আল্লাহর কিতাবে কোনো সিদ্ধান্ত না পাওয়া যায় তাহলে আমার সুন্নাহে খোঁজ করতে থাক। যদি তাতেও না পাওয়া যায় তাহলে আমার সাহাবায়ে কেরামের কথায় তালাশ করতে হবে। আমার সাহাবীরা আকাশের তারকা সদৃশ্য। তার কোনো একটিকে তোমরা গ্রহণ করলে সঠিক পথ পাবে। আর আমার সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক ইখতিলাফ বা মতপার্থক্য তোমাদের জন্য রহমতস্বরূপ।’’[১]

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «سَأَلْتُ رَبِّيْ فِيْمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ أَصْحَابِيْ مِنْ بَعْدِيْ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيَّ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ أَصْحَابَكَ عِنْدِيْ بِمَنْزِلَةِ النُّجُوْمِ فِي السَّمَاءِ، بَعْضُهَا أَضْوَأُ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ أَخَذَ بِشَيْءٍ مِمَّا هُمْ عَلَيْهِ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ فَهُمْ عِنْدِيْ عَلَىٰ هُدًى».

‘হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আমার পরে আমার সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক মতপার্থক্য সম্পর্কে আমার রব (প্রভু)-কে জিজ্ঞেস করলাম। আল্লাহ আমার কাছে ওহী পাঠালেন, হে মুহাম্মদ! তোমার সাহাবীরা আমার কাছে আকাশের তারকা সদৃশ। তারকার মতো তাঁরাও একটি থেকে অন্যটি উজ্জ্বলতর। তাঁদের বিতর্কিত বিষয়ের কোনো একটিকে যে আঁকড়ে থাকবে, আমার কাছে সে হবে হিদায়তের ওপরে।’’[২]

[১] (ক) আল-বায়হাকী, ***আল-মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা***, পৃ. ১৬২, হাদীস: ১৫২; (খ) আল-খতীবুল বাগদাদী, ***আল-কিফায়া ফী মা'রিফাতি উসূলি 'ইলমির রিওয়ায়া***, পৃ. ৪৮

[২] (ক) ইবনে বাত্তাহ আল-উকবারী, ***আল-ইবানাতুল কুবরা***, খ. ২, পৃ. ৫৬৩, হাদীস: ৭০০; (খ) আল-বায়হাকী, ***আল-মদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা***, পৃ. ১৬২, হাদীস: ১৫১; (গ) আল-খতীবুল বাগদাদী,

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বর্ণনা করেছেন,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ اخْتَارَنِيْ وَاخْتَارَ أَصْحَابِيْ فَجَعَلَهُمْ أَصْهَارِيْ، وَجَعَلَهُمْ أَنْصَارِيْ، وَإِنَّهُ سَيَجِيءُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَنْتَقِصُوْنَهُمْ، أَلَا فَلَا تُنَاكِحُوْهُمْ ، أَلَا فَلَا تَنْكِحُوْا إِلَيْهِمْ، أَلَا فَلَا تُصَلُّوْا مَعَهُمْ، أَلَا فَلَا تُصَلُّوْا عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ، حَلَّتِ اللَّعْنَةُ».

‘হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ আমাকে ও আমার সাহাবায়ে কেরামকে মনোনীত করেছেন। তাঁদের সাথে আমার বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছেন এবং তাঁদেরকে আমার আনসার বানিয়ে দিয়েছেন। শেষ যামানায় এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে যারা তাঁদের অবমাননা করবে। সাবধান! তোমরা তাদের ছেলে-মেয়ে বিয়ে করবে না, তাদের কাছে ছেলে-মেয়ে বিয়েও দেবে না। সাবধান! তাদের সাথে নামায পড়বে না, তাদের জানাযাও পড়বে না। তাদের ওপর আল্লাহর লা'নত।’’[১]

মিশকাত শরীফে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসুল (সা.) বলেছেন,

«وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَّاحِدَةً»، قَالُوْا: وَمن هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ» .

‘আমার উম্মতের মধ্যে ৭৩ ফিরকা হবে, সবাই জাহান্নামী, একটি ফিরকাই নিশ্চিত জান্নাতী হবে।’ জিজ্ঞেস করা হলো, তাঁরা কে? বললেন, ‘যারা আমার ও আমার সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।’’[২]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে,

আল-ফকীহ ওয়াল মুত্তাফাকিহ, খ. ১, পৃ. ৪৪৩, হাদীস: ৪৬৬; (ঘ) আল-খতীবুল বাগদাদী, ***আল-কিফায়া ফী মা'রিফাতি উসূলি 'ইলমির রিওয়ায়া***, পৃ. ৪৮, ভাষ্য আল-খতীব আল-বাগদাদীর

[১] (ক) আবু বকর আল-খাল্লাল, ***আস-সুন্নাহ***, খ. ২, পৃ. ৪৮৩, হাদীস: ৭৬৯; (খ) আল-উকায়লী, ***আয-যু'আফাউল কবীর***, খ. ১, পৃ. ১২৭, হাদীস: ১৫৫; (গ) আল-খতীবুল বাগদাদী, ***আল-জামি' লি-আখলাকির রাওয়ী ওয়া আদাবিস সামি'***, খ. ২, পৃ. ১১৮, হাদীস: ১৩৫৩; (ঘ) আল-খতীবুল বাগদাদী, ***আল-কিফায়া ফী মা'রিফাতি উসূলি 'ইলমির রিওয়ায়া***, পৃ. ৪৮, ভাষ্য আল-খতীব আল-বাগদাদীর

[২] (ক) আত-তিরমিযী, ***আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান***, খ. ৫, পৃ. ২৬, হাদীস: ২৬৪১; (খ) আত-তাবরীযী, ***মিশকাতুল মাসাবীহ***, খ. ১, পৃ. ৬১, হাদীস: ১৭১, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ مَثَلَ أَصْحَابِيْ فِيْ أُمَّتِيْ كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ».

'হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের স্থান তেমন, যেমন খাবারের মধ্যে লবণের স্থান।''[১]

সাহাবায়ে কেরামের সমাজ ছিল একটি আদর্শ মানব সমাজ। তাঁদের কর্মকাণ্ড মানব জাতির জন্য একটি উৎকৃষ্টতম নমুনা স্বরূপ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের সততা, বিশ্বস্ততা, ভদ্রতা, আত্মত্যাগ ও সদাচরণ তুলনাবিহীন। তাঁরা ছিলেন একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিশীল। গরীব ও মুহতাজ শ্রেণির প্রয়োজন ও চাহিদাকে তাঁরা সবসময় অগ্রাধিকার দিতেন। বীরত্ব ও সাহসিকতায় তাঁরা ছিলেন নজীরবিহীন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইত্তেবা বা অনুসরণ ছিল তাঁদের জীবনের মূল লক্ষ্য। তাঁদের জীবন-মরণ উভয়ই ছিল ইসলামের জন্য।

হযরত রাসুল করীম (সা.) যে সর্বোত্তম সমাজের ভিত্তি রেখেছিলেন, সাহাবায়ে কেরাম হচ্ছেন সেই সমাজের প্রথম নমুনা। রাসুল পাক (সা.)-এর সুহবতের বরকতে তাঁরা মহান মানবতার বাস্তব রূপ ধারণ করেছিলেন। 'আদল, তাকওয়া, দিয়ানাত, ইহসান এবং খাওফে খোদার তাঁরা ছিলেন সমুজ্জ্বল প্রতীক। তাঁদের মধ্যে এ অনুভূতি সদা জাগ্রত ছিল যে, এ পৃথিবীতে তাঁদের আগমণ ইসলামের ঝাণ্ডা সমুন্নত করা ও মানব জাতির মধ্যে সমতা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য। এখানে তাঁদেরকে খিলাফতে ইলাহিয়ার আমীন বা বিশ্বাসীরূপে আল্লাহর উদ্দেশ্য পূরণ করতে হবে।

পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা তাঁদের মধ্যে এমন পরিচ্ছন্ন হৃদয় ও ন্যায়ের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছিল যে, হক ও ইনসাফের ব্যাপারে তাঁরা যেমন নিজেদেরকে দায়িত্বশীল মনে করতেন, তেমন মনে করতেন অন্যদেরকেও। তাঁরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও নিজেদের সন্তান ও আত্মীয়-বন্ধুদের শরয়ী বিধানের শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারেননি, বাঁচাতে চেষ্টাও করেননি।

[১] (ক) আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, ***আয-যুহদ ওয়ার রাকায়িক***, পৃ. ২০০, হাদীস: ৫৭২; (খ) আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী, ***আল-মুসনদ***, খ. ৫, পৃ. ১৫১, হাদীস: ২৭৬২; (গ) আল-আজুর্‌রী, ***আশ-শরীআ***, খ. ৪, পৃ. ১৬৮৩, হাদীস: ১১৫৭; (ঘ) আল-কুযায়ী, ***মুসনদুশ শিহাব***, খ. ২, পৃ. ২৭৫, হাদীস: ১৩৪৭

মোটকথা ঈমান ও বিশ্বাস তাদের সামগ্রিক যোগ্যতাকে আলোকিত করে দিয়েছিল। তাঁরা খুব অল্প সময়ে বিশ্বের সর্বাধিক অংশ প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁদের সামরিক ও সাংগঠনিক যোগ্যতার ভুরিভুরি নজীর ইতিহাসের পাতায় বিদ্যমান।

সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ সমাজের অনুরূপ সমাজ যদি আজ আমরা গড়তে চাই আমাদের অবশ্যই তাঁদের সম্পর্কে জানতে হবে। তাঁদের মতো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে কুরআনী সমাজ গড়ার যে চেতনা দেখা যাচ্ছে, তাকে সঠিক লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যেতে হলে সাহাবায়ে কেরামের জীবনীর ব্যাপক চর্চা হওয়া দরকার। তাঁদের জীবন থেকেই দিক-নির্দেশনা নিতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাঙালি মুসলিম সমাজে সাহাবায়ে কেরামের জীবনের চর্চা খুব কম। এখানে পীর-আওলিয়ার জীবনের কাল্পনিক কিস্‌সা-কাহিনি যে পরিমাণে আলোচিত হয় তার কিয়দংশও সাহাবায়ে কেরামের জীবনীর আলোচনা হয় না।

আরবি-উর্দুসহ পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় সাহাবায়ে কেরামের জীবনীর ওপর বহু বড় বড় গ্রন্থ রচিত হয়েছে। ইসলামি সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় এক্ষেত্রেও বাংলা ভাষায় উল্লেখযোগ্য তেমন কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। তাঁদের মধ্যে আশারা মুবাশ্‌শারার সেই গৌরবান্বিত দশজন সাহাবীর জীবনকথা সন্নিবেশিত হয়েছেন। লেখাগুলো সংক্ষিপ্ত হলেও তথ্যসমূহ আরবি-উর্দুর মূল সূত্রসমূহ থেকে গৃহীত হয়েছে। বিতর্কিত বিষয় যথাসম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশেষে পাঠকবৃন্দ এ লেখা থেকে বিন্দুমাত্র উপকৃত হলে আমার কষ্ট সার্থক বলে মনে করবো। কোথাও কোনো ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা আমাদের গোচরে আনার জন্য পাঠকদের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী
চেয়ারম্যান, আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন
পীর সাহেব, বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম

৩০ জুলাই ২০১৯

সূচিপত্র

ভূমিকা ৩
সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা ৬
সাহাবী চেনার উপায় ৮
সাহাবায়ে কেরামের সংখ্যা ৯

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) ২৩
নাম-নসব ও বংশ ২৩
হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর পিতা ২৪
হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর মাতা ২৪
ইসলামপূর্ব জীবন ২৪
ইসলাম গ্রহণ ২৫
ইসলাম প্রচার ২৬
মক্কী জীবন ২৬
আবিসিনিয়ায় হিজরতের বাসনা ২৮
মদীনায় হিজরত ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমত ২৮
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৩০
হজে নেতৃত্ব ও নামাযে ইমামতি ৩০
খলীফা মনোনীত ৩১
সাকীফায়ে বনি সায়িদায় সভা ৩২
হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাযি.)-এর নেতৃত্বে অভিযান ৩৩
যাকাত অস্বীকারকারীদের সতর্ক ৩৫
নুবুওয়াতের দাবিদারদের দমন ৩৫
অনাড়ম্বর জীবন ৩৬
উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি ৩৬
কুরআন সংরক্ষণ ৩৭
ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা ৩৭
ওফাত ৩৮

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) ৩৯
নাম-নসব ও বংশ ৩৯
হযরত ওমর (রাযি.)-এর চাচাতো ভাই ৩৯

হযরত ওমর (রাযি.)-এর জন্ম ৩৯
হযরত ওমর (রাযি.)-এর যৌবন ৪০
হযরত ওমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ ৪২
হযরত ওমর (রাযি.)-এর হিজরত ৪৭
হযরত ওমর (রাযি.)-এর ভ্রাতৃত্ব ৪৮
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৪৮
খিলাফত লাভ ৫২
শাসন ও বিজয় ৫৪
ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা ৫৫
জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ৫৬
শাহাদত ৫৭

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাযি.) ৫৯
নাম-নসব ও বংশ ৫৯
ইসলামপূর্ব জীবন ৫৯
ইসলাম গ্রহণ ৬০
বিয়ে ৬২
হিজরত ৬৩
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৬৪
খলীফা নির্বাচিত ৬৬
দুস্কৃত শক্তির বিদ্রোহ ও শাহাদত ৭০
হযরত উসমান (রাযি.)-এর অবদান ৭১
ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা ৭১

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.) ৭৩
নাম-নসব ও বংশ ৭৩
ইসলাম গ্রহণ ৭৩
হিজরত ৭৪
দীনী ভ্রাতৃত্ব ৭৫
নবীকন্যা হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর সাথে বিয়ে ৭৬
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৭৬
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দূত হিসেবে ৭৮
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর গোসল কাজে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য ৭৯
খলীফা নির্বাচিত ৮০
জঙ্গে জামাল ৮১
জঙ্গে সিফফীন ৮২

শাহাদত ৮৪
ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা ৮৬
ন্যায়বিচার ৮৬
ক্ষুধা ও দারিদ্র্য ৮৭
জ্ঞানের প্রবেশদ্বার ৮৮
সাহিত্য ও কবিতা ৮৯
সন্তান-সন্ততি ৮৯
গুণাবলি ৯০

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.) ৯১
নাম-নসব ও বংশ ৯১
ইসলাম গ্রহণ ৯২
হিজরত ৯৩
মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ৯৩
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ৯৪
হযরত ওমর (রাযি.) কর্তৃক গঠিত বোর্ডের সদস্য ৯৮
জঙ্গে জামালের ঘটনা ৯৯
শাহাদত ১০০
স্বভাব-চরিত্র ১০১
হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা ১০২
সাম্যের প্রতি অনুরাগ ১০৩
সাহসিকতা ১০৩
আমানতদারিতা ১০৪
সন্তানদের স্নেহ ১০৪
দানশীলতা ও বদান্যতা ১০৫
ব্যবসা-বাণিজ্য ১০৫
আল্লাহর রাস্তায় ত্যাগ ১০৫
পোশাক-পরিচ্ছদ ১০৬
ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা ১০৬

হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাযি.) ১০৭
নাম-নসব ও বংশ ১০৭
ইসলাম গ্রহণ ১০৭
হিজরত ১০৯
মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ১১০
যুদ্ধে অংশগ্রহণ ১১০

হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর আমলে ১১৩
হযরত ওমর (রাযি.)-এর আমলে ১১৫
হযরত উসমান (রাযি.)-এর আমলে ১১৫
ওফাত ১১৬
দানশীলতা ১১৭

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) ১১৯
নাম-নসব ও বংশ ১১৯
ইসলাম গ্রহণ ১১৯
হিজরত ১২০
মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ১২০
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ১২১
আল্লাহর রাস্তায় দান ১২৪
নববী যুগে ইমামতি ১২৫
হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর যুগে ১২৫
হযরত ওমর (রাযি.)-এর যুগে ১২৬
হযরত উসমান (রাযি.)-এর যুগে ১৩০
ওফাত ১৩০
ব্যবসা-বাণিজ্য ১৩০
দানশীলতা ১৩১
তাকওয়া-পরহেযগারি ১৩২
ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা ১৩৩

হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.) ১৩৫
নাম-নসব ও বংশ ১৩৫
ইসলাম গ্রহণ ১৩৫
হিজরত ১৩৭
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ১৩৮
হযরত ওমর (রাযি.)-এর আমলে ১৪৪
হযরত উসমান (রাযি.)-এর আমলে ১৪৫
হযরত আলী (রাযি.)-এর আমলে ১৪৫
ওফাত ১৪৬
ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা ১৪৭
কাব্যপ্রতিভা ১৪৮

হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ (রাযি.) ১৪৯
নাম-নসব ও বংশ ১৪৯

ইসলাম গ্রহণ ১৫০
হিজরত ১৫০
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ.....১৫০
হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর আমলে ১৫৪
হযরত ওমর (রাযি.)-এর আমলে ১৫৫
ওফাত.....১৫৬
আমল-আখলাক.....১৫৮

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাযি.) ১৬১
নাম-নসব ও বংশ.....১৬১
ইসলাম গ্রহণ ১৬৪
যুদ্ধে অংশ গ্রহণ.....১৬৫
উমাইয়া যুগে ১৬৬
ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা.....১৬৯
ওফাত.....১৭০

তথ্যপঞ্জি ১৭১

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)

নাম-নসব ও বংশ

আবদুল্লাহ নাম, সিদ্দীক ও আতীক উপাধি, ডাকনাম বা কুনিয়াত আবু বকর। পিতার নাম উসমান, কুনিয়াত আবু কুহাফা। মাতার নাম সালমা এবং কুনিয়াত উম্মুল খায়ের।[১] কুরাইশ বংশের ওপর দিকে ষষ্ঠ পুরুষ মুররা পর্যন্ত গিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে।[২] রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের দু'বছরের কিছু বেশি সময় পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং অনুরূপ সময়ের ব্যবধানে তাঁরা উভয়ে ইনতিকাল করেন। তাই মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বয়সের সমান।

তিনি ছিলেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, পাতলা ছিপছিপে ও প্রশস্ত ললাট বিশিষ্ট। শেষ বয়সে চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল। মেহেন্দীর খিজাব লাগাতেন। অত্যন্ত দয়ালু ও সহনশীল ছিলেন।

তিনি ছিলেন সম্মানিত কুরাইশ ব্যক্তিবর্গের অন্যতম। জ্ঞান, মেধা, অভিজ্ঞতা, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও সচ্চরিত্রতার জন্য আপামর মক্কাবাসীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। জাহিলী যুগে মক্কাবাসীদের দিয়াত বা রক্তের ক্ষতিপূরণের সমুদয় অর্থ তাঁর কাছে জমা হতো। আরববাসীর নসব বা বংশ সংক্রান্ত জ্ঞানে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ। কাব্য প্রতিভাও ছিল। অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল-ভাষী ছিলেন। বক্তৃতা ও বাগ্মিতার খোদাপ্রদত্ত যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন।

তিনি ছিলেন তাঁর গোত্রের অত্যন্ত জনপ্রিয়, বন্ধুবৎসল ও অমায়িক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী, দানশীল ও চরিত্রবান। জাহিলী যুগেও কখনো শরাব পান করেননি। তাঁর অমায়িক মেলামেশা, পাণ্ডিত্য ও ব্যাবসায়িক দক্ষতার কারণে অনেকেই তাঁর সাথে বন্ধুত্ব ও সখ্যতা স্থাপন করতো। তাঁর বাড়িতে প্রতিদিন মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়মিত বৈঠক বসতো।

---

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ১৫৫, ক্রমিক: ৬৮

[২] শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, *সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম*, খ. ১, পৃ. ১৭

হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর পিতা

হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর পিতা আবু কুহাফা কুরাইশদের মধ্যে যথেষ্ট মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন বয়োবৃদ্ধ ও সচ্ছল। তাঁর গৃহ কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল না, সামাজিক কর্মকাণ্ডেও তাঁর মতামত অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করা হতো। মক্কা বিজয় পর্যন্ত ইসলামের প্রতি তিনি আকৃষ্ট না হলেও পুত্র হযরত আবু বকর (রাযি.)-কে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন এমন কোনো প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অবশ্য হযরত আলী (রাযি.)-কে তিনি দেখলে মাঝে মধ্যে বলতেন,

هَذَا مِنَ الصُّبَاةِ الَّذِيْنَ أَفْسَدُوْا عَلَيَّ ابْنِيْ.

'এ ছোকরারাই আমার ছেলেটিকে বিগড়ে দিয়েছে।'[১]

মক্কা বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলামের ঘোষণা দেন। হিজরী ১৪ সনে প্রায় একশ' বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন।[২]

হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর মাতা

হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর মা উম্মুল খায়ের স্বামীর বহু পূর্বে মক্কায় ইসলামের প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মক্কার দারুল আরকামে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। স্বামীর মতো তিনিও দীর্ঘজীবন লাভ করেন। প্রায় ৯০ বছর বয়সে ছেলেকে খিলাফতের পদে অধিষ্ঠিত রেখে ইহলোক ত্যাগ করেন।[৩]

ইসলামপূর্ব জীবন

হযরত আবু বকর (রাযি.) ছিলেন পিতার একমাত্র পুত্র সন্তান। অত্যন্ত আদর যত্ন ও বিলাসিতার মধ্যে পালিত হন। শৈশব থেকে যৌবনের সূচনা পর্যন্ত পিতার ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। বিশ বছর বয়সে পিতার ব্যবসা-বাণিজ্যের দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নেন।

---

[১] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ৪, পৃ. ৩৭৪

[২] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ৪, পৃ. ৩৭৫; (খ) শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, *সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম*, খ. ১, পৃ. ১৭–১৮

[৩] (ক) আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১, পৃ. ৫২, হাদীস: ২; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ৮, পৃ. ৩৮৬; (গ) শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, *সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম*, খ. ১, পৃ. ১৮

ইসলাম গ্রহণ

শৈশব থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে আবু বকর (রাযি.)-এর বন্ধুত্ব ছিল। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অধিকাংশ বাণিজ্য সফরের সঙ্গী ছিলেন। একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে ব্যবসায় উপলক্ষে সিরিয়া যান। তখন তাঁর বয়স প্রায় আঠারো এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বয়স বিশ। তাঁরা যখন সিরিয়া সীমান্তে বিশ্রামের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি গাছের নীচে বসেন। হযরত আবু বকর (রাযি.) একটু সামনে এগিয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন।

এক খ্রিস্টান পাদরির সাথে তাঁর দেখা হয় এবং ধর্মবিষয়ে কিছু কথা-বার্তা হয়। আলাপের মাঝখানে পাদরি জিজ্ঞেস করে, ওখানে গাছের নীচে কে? হযরত আবু বকর (রাযি.) বললেন, এক কুরাইশ যুবক, নাম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ। পাদরি বলে উঠলো, এ ব্যক্তি আরবদের নবী হবেন। কথাটি হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর অন্তরে গেঁথে যায়। তখন থেকেই তাঁর অন্তরে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রকৃত নবী হওয়া সম্পর্কে প্রত্যয় দৃঢ় হতে থাকে। ইতিহাসে এ পাদরির নাম 'বুহাইরা' বা 'নাসতুরা' বলে উল্লেখিত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নুবুওয়াত লাভের ঘোষণায় মক্কায় হৈ-চৈ পড়ে গেল। মক্কার প্রভাবশালী ধনী নেতৃবৃন্দ তাঁর বিরোধিতায় কোমর বেঁধে লেগে যায়। কেউবা তাঁকে মাথা খারাপ, কেউবা জীনে ধরা বলতে থাকে। নেতৃবৃন্দের ইঙ্গিতে ও তাদের দেখাদেখি সাধারণ লোকেরাও ইসলাম থেকে দূরে সরে থাকে। কুরাইশদের ধনবান ও সম্মানী ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র হযরত আবু বকর (রাযি.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে সঙ্গ দেন, তাঁকে সাহস দেন এবং বিনা দ্বিধায় তাঁর নুবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনেন। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেছেন,

«مَا عَرَضْتُ الْإِسْلَامَ عَلَىٰ أَحَدٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نَظْرَةٌ غَيْرَ أَبِيْ بَكْرٍ، فَإِنَّهُ لَمْ يَتَلَعْثَمْ».

'আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি একমাত্র আবু বকর ছাড়া প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু দ্বিধার ভাব লক্ষ করেছি।'[১]

[১] আদ-দায়লামী, ***আল-ফিরদাউসু বি-মাসূরিল খিতাব***, খ. ৪, পৃ. ৯২, হাদীস: ৬২৮৬, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) থেকে বর্ণিত

এভাবে হযরত আবু বকর (রাযি.) হলেন বয়স্ক আযাদ লোকদের মধ্যে প্রথম মুসলমান।[১]

ইসলাম প্রচার

মুসলমান হওয়ার পর ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে দাওয়াতী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মক্কার আশপাশের গোত্রসমূহে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। হজের মওসুমে বিভিন্ন তাঁবুতে গিয়ে লোকদের দাওয়াত দিতেন। বহিরাগত লোকদের কাছে ইসলামের ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পরিচয় তুলে ধরতেন। এভাবে আরববাসী রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রচারিত দীন সম্পর্কে অবহিত হয়ে তাঁর ওপর ঈমান আনে। তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব ও চেষ্টায় তৎকালীন কুরাইশবংশের বিশিষ্ট যুবক হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাযি.), হযরত যুবাইর ইবনুল আউওয়াম (রাযি.), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.), হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.) ও হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.)-এর মতো ব্যক্তিরাসহ আরও অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[২]

মক্কী জীবন

রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন নুবুওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা দিলেন, হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর নিকট তখন চল্লিশ হাজার দিরহাম ছিল, ইসলামের জন্য তিনি তাঁর সকল সম্পদ ওয়াক্‌ফ করে দেন। কুরাইশদের যেসব দাস-দাসী ইসলাম গ্রহণের কারণে নিগৃহীত ও নির্যাতিত হচ্ছিল এ অর্থ দ্বারা তিনি সেই সব দাস-দাসী খরিদ করে আযাদ করেন। তেরো বছর পর যখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তিনি মদীনায় হিজরত করেন তখন তাঁর কাছে এ অর্থের মাত্র আড়াই হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল। অল্পদিনের মধ্যে অবশিষ্ট দিরহামসমূহও ইসলামের জন্য ব্যয়িত হয়।

হযরত বিলাল (রাযি.), হযরত খাব্বাব (রাযি.), হযরত আম্মার (রাযি.), আম্মারের মা হযরত সুমাইয়া (রাযি.), হযরত সুহাইব (রাযি.), হযরত আবু ফুকাইহ (রাযি.) প্রমুখ দাস-দাসী তাঁরই অর্থের বিনিময়ে

[১] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ***ফাতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী***, খ. ৭, পৃ. ১৭০; (খ) শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, ***সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম***, খ. ১, পৃ. ২০

[২] শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, ***সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম***, খ. ১, পৃ. ২০

দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভ করেন। তাই পরবর্তীকালে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

«مَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلَّا وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا نَفَعَنِيْ مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِيْ مَالُ أَبِيْ بَكْرٍ».

'আমি প্রতিটি মানুষের ইহসান পরিশোধ করেছি। কিন্তু আবু বকরের ইহসানসমূহ এমন যে, তা পরিশোধ করতে আমি অক্ষম। তার প্রতিদান আল্লাহ দেবেন। তার অর্থ আমার উপকারে যেমন এসেছে, অন্য কারো অর্থ তেমন আসেনি।'[১]

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মুখে মি'রাজের কথা শুনে অনেকেই যখন বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝখানে দোল খাচ্ছিল, তখন তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। হযরত হাসান আল-বাসরী (রহ.) বলেন, মি'রাজের কথা শুনে বহুসংখ্যক মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে। লোকেরা হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর কাছে গিয়ে বলে, আবু বকর! তোমার বন্ধুকে তুমি বিশ্বাস কর? সে বলেছে, সে নাকি গতরাতে বায়তুল মাকদাসে গিয়েছে, সেখানে সে নামায পড়েছে, অতঃপর মক্কায় ফিরে এসেছে।

হযরত আবু বকর (রাযি.) বললেন, তোমরা কি তাকে অবিশ্বাস কর? তারা বলল, হ্যাঁ, ওই তো মসজিদে বসে লোকজনকে একথাই বলছে। হযরত আবু বকর (রাযি.) বললেন, আল্লাহর কসম, তিনি যদি একথা বলে থাকেন তাহলে সত্য কথাই বলেছেন। এতে অবাক হওয়ার কি দেখলে? তিনি তো আমাকে বলে থাকেন, তাঁর কাছে আল্লাহর কাছ থেকে ওহী আসে। আকাশ থেকে ওহী আসে মাত্র এক মুহূর্তের মধ্যে। তাঁর সে কথাও আমি বিশ্বাস করি। তোমরা যে ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করছো এটা তার চেয়েও বিস্ময়কর।

তারপর তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি কি জনগণকে বলছেন যে, আপনি গতরাতে বায়তুল মাকদাস ভ্রমণ করেছেন? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' হযরত আবু বকর (রাযি.) বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রাসুল। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন,

[১] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান*, খ. ৫, পৃ. ৬০৯, হাদীস: ৩৬৬১, হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

«وَأَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقُ».

'হে আবু বকর! তুমি সিদ্দীক।'

এভাবে হযরত আবু বকর (রাযি.) সিদ্দীক উপাধিতে ভূষিত হন।[১]

মক্কায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অভ্যাস ছিল প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর বাড়িতে গমন করা। কোনো বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজন হলে তাঁর সাথে পরামর্শ করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে কোথাও গেলে তিনিও সাধারণত সঙ্গে থাকতেন।[২]

আবিসিনিয়ায় হিজরতের বাসনা

মুসলমানদের ওপর মুশরিকদের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করলে একবার তিনি হাবশায় হিজরত করার ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু ইবনুদ দুগুন্নাহ নামক এক গোত্রপতি তাঁকে এ সিদ্ধান্ত থেকে বিরত রাখে। সে কুরাইশদের হাত থেকে এ শর্তে নিরাপত্তা দেয় যে, আবু বকর প্রকাশ্যে সালাত আদায় করবেন না, কিন্তু দীর্ঘদিন এ শর্ত পালন করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ইবনুদ দুগুন্নাহর নিরাপত্তা ফিরিয়ে দেন এবং অন্যান্য মুসলমান ভাইদের যে অবস্থা হয় সন্তুষ্টচিত্তে তা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।[৩]

মদীনায় হিজরত ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমত

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হিজরতের সে কঠিন মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর কুরবানি, বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য ও বন্ধুত্বের কথা ইতিহাসে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। তাঁর সাহচর্যের কথা তো পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন, হযরত আবু বকর (রাযি.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে হিজরতের অনুমতি চাইলে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বলতেন,

«لَا تَعْجَلْ لَعَلَّ اللهَ يَجْعَلُ لَكَ صَاحِبًا».

'তুমি তাড়াহুড়া করো না। আল্লাহ হয়তো তোমাকে একজন সহযাত্রী জুটিয়ে দেবেন।'[৪]

[১] ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়া*, খ. ১, পৃ. ৩৯৯

[২] শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, *সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম*, খ. ১, পৃ. ২০

[৩] শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, *সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম*, খ. ১, পৃ. ২১–২২

[৪] ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়া*, খ. ১, পৃ. ৪৮০

হযরত আবু বকর (রাযি.) একথা শুনে ভাবতেন যে, রাসুলুল্লাহ (সা.) হয়তো নিজের কথাই বলছেন। তাই তিনি তখন থেকেই দুটো উট কিনে অত্যন্ত যত্ন সহকারে পুষতে থাকেন। এ আশায় যে, হিজরতের সময় হয়তো কাজে লাগতে পারে।

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাযি.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) দিনে অন্তত একবার হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর বাড়িতে আসতেন। যে দিন হিজরতের অনুমতি পেলেন সেদিন দুপুরে আমাদের বাড়িতে আসলেন, এমন সময় কখনো তিনি আসতেন না। তাঁকে দেখামাত্র হযরত আবু বকর (রাযি.) বলে উঠলেন, নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে। তা নাহলে এমন সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) আসতেন না। তিনি বাড়িতে প্রবেশ করলে হযরত আবু বকর (রাযি.) তাঁর খাটের একধারে সরে বসলেন। হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর বাড়িতে তখন আমি আর আমার বোন আসমা ছাড়া আর কেউ ছিল না।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তোমার এখানে অন্য যারা আছে তাদেরকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দাও।' হযরত আবু বকর (রাযি.) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার দু'মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই। আপনার কি হয়েছে? রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'আল্লাহ আমাকে হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন।' হযরত আবু বকর (রাযি.) জিজ্ঞেস করলেন, আমিও কি সঙ্গে যেতে পারবো? রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'হ্যাঁ, যেতে পারবে।'

হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, সে দিনের আগে আমি জানতাম না যে, মানুষ আনন্দের আতিশয্যে এত কাঁদতে পারে। আমি হযরত আবু বকর (রাযি.)-কে সেদিন কাঁদতে দেখেছি। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাযি.) বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! এই দেখুন, আমি এ উটদুটো এ কাজের জন্যই প্রস্তুত করে রেখেছি।

তাঁরা আবদুল্লাহ ইবনে আরকাতকে পথ দেখিয়ে নেওয়ার জন্য ভাড়া করে সাথে নিলেন। সে ছিল মুশরিক, তবে বিশ্বাসভাজন। রাতের আঁধারে তাঁরা হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর বাড়ির পেছন দরজা দিয়ে বের হলেন এবং মক্কার নিম্নভূমিতে সাওর পর্বতের একটি গুহায় আশ্রয় নিলেন।[১]

[১] ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়া*, খ. ১, পৃ. ৪৮৪–৪৮৫

হযরত হাসান আল-বাসরী (রাযি.) থেকে ইমাম ইবনে হিশাম (রহ.) বর্ণনা করেন, তাঁরা রাতে সাওর পর্বতের গুহায় পৌঁছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রবেশের আগে হযরত আবু বকর (রাযি.) গুহায় প্রবেশ করলেন। সেখানে কোনো হিংস্র প্রাণী বা সাপ-বিচ্ছু আছে কিনা তা দেখে নিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বিপদমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই তিনি এরূপ ঝুঁকি নিয়েছিলেন।[১]

মক্কায় উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজার ওফাতের পর রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে যখন হযরত আবু বকর (রাযি.) বিমর্ষ দেখলেন, অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আদব সহকারে নিজের অল্প-বয়স্কা কন্যা হযরত আয়িশা (রাযি.)-কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বিয়ে দেন। মোহরের অর্থও নিজেই পরিশোধ করেন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হিজরতের পর সকল অভিযানেই তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। কোনো একটি অভিযানেও অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হননি। তাবুক অভিযানে তিনি ছিলেন মুসলিম বাহিনীর পতাকাবাহী। এ অভিযানের সময় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আবেদনে সাড়া দিয়ে বাড়িতে যা কিছু অর্থ-সম্পদ ছিল সবই তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে তুলে দেন। আল্লাহর রাসুল (সা.) জিজ্ঞেস করেন, 'ছেলে-মেয়েদের জন্য বাড়িতে কিছু রেখেছো কি?' জবাব দিলেন, তাদের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলই যথেষ্ট।[২]

হজে নেতৃত্ব ও নামাযে ইমামতি

মক্কা বিজয়ের পর নবম হিজরীতে প্রথম হজ আদায় উপলক্ষে রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু বকর (রাযি.)-কে আমীরুল হজ নিয়োগ করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তিম রোগশয্যায় তাঁরই নির্দেশে মসজিদে নববীর নামাযের ইমামতির দায়িত্ব পালন করেন। মোটকথা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় হযরত আবু বকর (রাযি.) তাঁর উযীর ও উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন।[৩]

[১] ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়া*, খ. ১, পৃ. ৪৮৬

[২] (ক) আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ২, পৃ. ১২৯, হাদীস: ১৬৭৮; (খ) শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, *সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম*, খ. ১, পৃ. ২২

[৩] শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, *সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম*, খ. ১, পৃ. ৩৩

খলীফা মনোনীত

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর (রাযি.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। খলীফাতু রাসুলিল্লাহ এ লকবটি কেবল তাঁকেই দেওয়া হয়। পরবর্তী খলীফাদের আমীরুল মুমিনীন উপাধি দেওয়া হয়েছে।

ব্যবসা ছিল তাঁর পেশা। ইসলামপূর্ব যুগে কুরাইশদের এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরেও জীবিকার প্রয়োজনে এ পেশা চালিয়ে যেতে থাকেন। তবে খলীফা হওয়ার পর খিলাফতের গুরু দায়িত্ব কাঁধে পড়ায় ব্যবসার পাট চুকাতে বাধ্য হন। হযরত ওমর (রাযি.) ও হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-এর পীড়াপীড়িতে মজলিসে শুরার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজন অনুপাতে বায়তুল মাল থেকে ন্যূনতম ভাতা গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন। যার পরিমাণ ছিল বাৎসরিক আড়াই হাজার দিরহাম। তবে মৃত্যুর পূর্বে তাঁর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে বায়তুল মাল থেকে গৃহীত সমুদয় অর্থ ফেরতদানের নির্দেশ দিয়ে যান।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের সংবাদে সাহাবামণ্ডলী যখন সম্পূর্ণ হতভম্ব, তাঁরা যখন চিন্তাই করতে পারছিলেন না, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত হতে পারে, এমনকি হযরত ওমর (রাযি.) কোষমুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে ঘোষণা করে বসেন, 'যে বলবে রাসুল (সা.)-এর ওফাত হয়েছে তাঁকে হত্যা করবো।' এমনই এক ভাব-বিহ্বল পরিবেশেও হযরত আবু বকর (রাযি.) ছিলেন অত্যন্ত দৃঢ় ও অবিচল। সমবেত জনতাকে লক্ষ করে তিনি ঘোষণা করেন,

«أَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا ﷺ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيٌّ لَّا يَمُوْتُ.

'যারা মুহাম্মদের ইবাদত করতে তারা জেনে রাখ, মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু যারা আল্লাহর ইবাদত কর তারা জেনে রাখ আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই।'[১]

তারপর এ আয়াত পাঠ করেন,

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ؕ اَفَاْئِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْ ؕ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۴۴﴾

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, ৫, পৃ. ৬, হাদীস: ৩৬৬৮, হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

'মুহাম্মদ আল্লাহর রাসুল ছাড়া আর কিছু নন। তাঁর পূর্বে বহু রাসুল অতিবাহিত হয়েছে। তিনি যদি মারা যান বা নিহত হন তাহলে তোমরা কি পেছনে ফিরে যাবে? যারা পেছনে ফিরে যাবে তারা আল্লাহর কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না। যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শিগগিরই আল্লাহ তাদের প্রতিদান দেবেন।'[১]

হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর মুখে এ আয়াত শোনার সাথে সাথে লোকেরা যেন সংবিৎ ফিরে পেল। তাদের কাছে মনে হল এ আয়াত যেন তারা এই প্রথম শুনেছে। এভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতিকালের সাথে সাথে প্রথম যে মারাত্মক সমস্যাটি দেখা দেয়, হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর দৃঢ় হস্তক্ষেপে তার পরিসমাপ্তি ঘটে।[২]

সাকীফায়ে বনি সায়িদায় সভা

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাফন-দাফন তখনো সম্পন্ন হতে পারেনি। এরই মধ্যে তাঁর স্থলাভিষিক্তির বিষয়টি জটিল আকার ধারণ করলো। মদীনার জনগণ, বিশেষত আনসাররা সাকীফা বনি সায়িদা নামক স্থানে সমবেত হলো। আনসাররা দাবি করলো, যেহেতু আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে আশ্রয় দিয়েছি, নিজেদের জান-মালের বিনিময়ে দুর্বল ইসলামকে সবল ও শক্তিশালী করেছি, আমাদের মধ্য থেকে কাউকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। মুহাজিরদের কাছে এ দাবি গ্রহণযোগ্য হলো না। তারা বললো, ইসলামের বীজ আমরা বপন করেছি এবং আমরাই তাতে পানি সিঞ্চন করেছি। সুতরাং আমরাই খিলাফতের অধিকতর হকদার।

পরিস্থিতি ভিন্নদিকে মোড় নিল। হযরত আবু বকর (রাযি.)-কে ডাকা হল। তিনি তখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পবিত্র মরদেহের নিকট। তিনি উপস্থিত হয়ে ধীর-স্থিরভাবে কথা বললেন। তাঁর যুক্তি ও প্রমাণের কাছে আনসাররা নতি স্বীকার করলো। এভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতিকালের পর দ্বিতীয় যে সমস্যাটি দেখা দেয়, হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় তারও সুন্দরভাবে সমাধান হয়ে যায়।[৩]

হযরত আবু বকর (রাযি.) খলীফা নির্বাচিত হলেন। খলীফা হওয়ার পর সমবেত মুহাজির ও আনসারদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন,

[১] আল-কুরআন, *সুরা আলে ইমরান*, ৩:১৪৪

[২] শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, *সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম*, খ. ১, পৃ. ৩৪–৩৫

[৩] শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, *সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম*, খ. ১, পৃ. ৩৬

فَإِنِّيْ وُلِّيْتُ هَذَا الْأَمْرَ وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، وَوَاللهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ كَفَانِيْهِ، أَلَا وَإِنَّكُمْ إِنْ كَلَّفْتُمُوْنِيْ أَنْ أَعْمَلَ فِيْكُمْ بِمِثْلِ عَمَلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَمْ أَقِمْ بِهِ، كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَبْدًا أَكْرَمَهُ اللهُ بِالْوَحْيِ وَعَصَمَهُ بِهِ، أَلَا وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَسْتُ بِخَيْرٍ مِّنْ أَحَدٍ مِّنْكُمْ، فَرَاعُوْنِيْ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْنِيْ اسْتَقَمْتُ فَاتَّبِعُوْنِيْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُوْنِيْ زِغْتُ فَقَوِّمُوْنِيْ.

'আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে খলীফা বানানো হয়েছে। আল্লাহর কসম, আমি চাচ্ছিলাম, আপনাদের মধ্য থেকে অন্য কেউ এ দায়িত্ব গ্রহণ করুক। আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনারা যদি চান আমার আচরণ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আচরণের মতো হোক, তাহলে আমাকে সেই পর্যায়ে পৌঁছার ব্যাপারে অক্ষম মনে করবেন। তিনি ছিলেন নবী। ভুল-ত্রুটি থেকে ছিলেন পবিত্র। তাঁর মতো আমার কোনো বিশেষ মর্যাদা নেই। আমি একজন সাধারণ মানুষ। আপনাদের কোনো একজন সাধারণ ব্যক্তি থেকেও উত্তম হওয়ার দাবি আমি করতে পারি না। ....আপনারা যদি দেখেন আমি সঠিক কাজ করছি, আমার সহায়তা করবেন। যদি দেখেন আমি বিপথগামী হচ্ছি, আমাকে সতর্ক করে দেবেন।'[১]

তাঁর সেই নীতিনির্ধারণী সংক্ষিপ্ত প্রথম ভাষণটি চিরকাল বিশ্বের সকল রাষ্ট্রনায়কদের জন্য অনুকরণীয় হয়ে থাকবে।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাযি.)-এর নেতৃত্বে অভিযান

তাঁর চরিত্রের সীমাহীন দৃঢ়তার আর এক প্রকাশ ঘটে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতিকালের পরে হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাযি.)-এর বাহিনীকে পাঠানোর মাধ্যমে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের অল্প কিছুদিন আগে মুতা অভিযানে শাহাদতপ্রাপ্ত হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রাযি.), হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব (রাযি.) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযি.)-এর রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। এ বাহিনীর কমাণ্ডার নিযুক্ত করেন নওজোয়ান হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাযি.)-কে।

[১] (ক) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ১৯৪, হাদীস: ৩৫৭২; (খ) আস-সুয়ুতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ. ৫৮

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে উসামা তাঁর বাহিনীসহ সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁরা মদীনা থেকে বের হতেই রাসুলুল্লাহ (সা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁরা মদীনার উপকণ্ঠে শিবির স্থাপন করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর রোগমুক্তির প্রতীক্ষা করতে থাকেন। কিন্তু এ রোগেই রাসুল (সা.) ইনতিকাল করেন। হযরত আবু বকর (রাযি.) খলীফা হলেন। এদিকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের সংবাদের আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন দিকে নানা অপশক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। কেউবা ইসলাম ত্যাগ করে, কেউবা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, আবার কেউবা নুবুওয়াত দাবি করে বসে।

এমন এক চরম অবস্থায় অনেকে পরামর্শ দিলেন হযরত উসামা (রাযি.)-এর বাহিনী পাঠানোর ব্যাপারটি স্থগিত রাখতে। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাযি.) অত্যন্ত কঠোরভাবে এ পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি যদি এ বাহিনী পাঠাতে ইতস্তত করতেন বা বিলম্ব করতেন তাহলে খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর এটা হতো রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশের প্রথম বিরুদ্ধাচরণ। কারণ অন্তিম রোগশয্যায় তিনি হযরত উসামা (রাযি.)-এর বাহিনীকে যাত্রার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

হযরত আবু বকর (রাযি.) হযরত উসামা (রাযি.)-এর বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন। তখন আনসারদের একটি দল দাবি করলেন, তাহলে অন্তত হযরত উসামা (রাযি.)-কে কমান্ডরের পদ থেকে সরিয়ে অন্য কোনো বয়স্ক সাহাবীকে তাঁর স্থলে নিয়োগ করা হোক। উল্লেখ্য যে, তখন হযরত উসামা (রাযি.)-এর বয়স মাত্র বিশ বছর। সকলের পক্ষ থেকে প্রস্তাবটি হযরত ওমর (রাযি.) উপস্থাপন করলেন। প্রস্তাব শুনে হযরত আবু বকর (রাযি.) রাগে ফেটে পড়লেন। তিনি হযরত ওমর (রাযি.)-এর দাড়ি মুট করে বললেন,

اسْتَعْمَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَتَأْمُرَنِيْ أَنْ أَنْزِعَهُ.

'রাসুলুল্লাহ (সা.) যাকে নিয়োগ করেছেন আবু বকর তাকে অপসারণ করবে?'[১]

এভাবে এ প্রস্তাব তিনি প্রতাখ্যান করেন। হযরত ওমর (রাযি.)ও ছিলেন হযরত উসামা (রাযি.)-এর বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত একজন সৈনিক। অথচ নতুন খলীফার জন্য তখন তাঁর মদীনায় থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। খলীফা ইচ্ছা

[১] ইবনে জরীর আত-তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক = তারীখুত তাবারী*, খ. ৩, পৃ. ২২৬

করলে তাঁকে নিজেই মদীনায় থেকে যাওয়ার নির্দেশ দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি হযরত উসামা (রাযি.)-এর ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ না করে তাঁর কাছে আবেদন জানালেন হযরত ওমর (রাযি.)-কে মদীনায় রেখে যাওয়ার জন্য।

হযরত উসামা (রাযি.) খলীফার আবেদন মঞ্জুর করলেন। কারণ হযরত আবু বকর (রাযি.) বুঝেছিলেন হযরত উসামা (রাযি.)-এর নিয়োগকর্তা খোদ রাসুলুল্লাহ (সা.)। সুতরাং এ ক্ষেত্রে হযরত উসামা (রাযি.)-এর ক্ষমতা তাঁর ক্ষমতার ওপরে। এভাবে হযরত আবু বকর (রাযি.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদেশ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেন এবং তাঁর সামান্যতম বিরুদ্ধাচরণ থেকেও বিরত থাকেন।

যাকাত অস্বীকারকারীদের সতর্ক

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতিকালের পর আবাস ও জুবইয়ান গোত্রদ্বয় যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। বিষয়টি নিয়ে খলীফার দরবারে পরামর্শ হয়। সাহাবায়ে কেরামের অনেকেই তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান না চালানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রাযি.) অটল। তিনি বললেন,

وَاللهِ لَوْ مَنَعُوْنِيْ عَنَاقًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا إِلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَىٰ مَنْعِهَا.

'আল্লাহর কসম! রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে উটের যে বাচ্চাটি যাকাত পাঠানো হতো এখন যদি কেউ তা দিতে অস্বীকার করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবো।'[১]

নুবুওয়াতের দাবিদারদের দমন

কিছু লোক নুবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার ছিল। হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর অসীম সাহস ও দৃঢ়তা সহকারে এসব ভণ্ডনবীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ইসলামের বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাত করে দেন। তাই ইতিহাসবিদরা মন্তব্য করেছেন, আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তার পর যদি হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর এ দৃঢ়তা না হতো, মুসলিম জাতির ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লেখা হতো।

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, ২, পৃ. ১০৫–১০৬, হাদীস: ১৪০০, হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত; (খ) শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, *সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম*, খ. ১, পৃ. ৪২

এমনটি সম্ভব হয়েছে এজন্য যে, হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর স্বভাবে দুটি পরস্পরবিরোধী গুণের সমাবেশ ঘটেছিল, সীমাহীন দৃঢ়তা ও কোমলতা। এ কারণে তাঁর চরিত্রে সর্বদা একটা ভারসাম্য বিরাজমান ছিল। কোনো ব্যক্তির স্বভাবে যদি এ দুটি গুণের কেবল একটি বর্তমান থাকে এবং অন্যটি থাকে অনুপস্থিত, তখন তার চরিত্রের ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ারসমূহ সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে এ দুটি গুণ তাঁর চরিত্রে সমানভাবে বিদ্যমান ছিল।[১]

অনাড়ম্বর জীবন

হযরত আবু বকর (রাযি.) যদিও মুসলমানদের নেতা ও খলীফা ছিলেন, তবুও তাঁর জীবন ছিল খুব অনাড়ম্বর। খলীফা হওয়া সত্ত্বেও মদীনার অলিগলিতে ঘুরে ঘুরে জনগণের অবস্থা জানতেন এবং তাদের ব্যক্তিগত কাজও সময় সময় নিজ হাতে করে দিতেন। হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, আমি প্রতিদিন সকালে এক বৃদ্ধার বাড়িতে তার ঘরের কাজ করে দিতাম। প্রতিদিনের মতো একদিন তার বাড়িতে উপস্থিত হলে বৃদ্ধা বললেন, আজ কোনো কাজ নেই। এক নেককার ব্যক্তি তোমার আগেই কাজসমূহ শেষ করে গেছে। হযরত ওমর পরে জানতে পারেন, সেই নেককার লোকটি হযরত আবু বকর (রাযি.)। খলীফা হওয়া সত্ত্বেও এভাবে এক অনাথ বৃদ্ধার কাজ করে দিয়ে যেতেন। হযরত আবু বকর (রাযি.) মাত্র আড়াই বছরের মতো খিলাফত পরিচালনা করেন। তবে তাঁর এ সময়টুকু ইসলামের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতিকালের পর তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অবদান হচ্ছে, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা। আরবের বিদ্রোহসমূহ নির্মূল করা। রাষ্ট্র ও সরকারকে তিনি এতো মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন যে, মুসলমানরা ইরান ও রোমের মতো দু'পরাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে সাহসী হয় এবং অল্পসময়ের মধ্যে তাদের বহু অঞ্চল দখল করে নেয়।

[১] শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, *সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম*, খ. ১, পৃ. ৪১

কুরআন সংরক্ষণ

হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর আরেকটি অবদান পবিত্র কুরআনের সংকলন ও সংরক্ষণ। তাঁর খিলাফতকালের প্রথম অধ্যায়ে আরবের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সেইসব বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে কয়েকশত হাফেজে কুরআন শাহাদত বরণ করেন। শুধুমাত্র মুসায়লামা কায্যাবের সাথে যে যুদ্ধ হয় তাতেই সাতশ' হাফিয শহীদ হন। অতঃপর হযরত ওমর (রাযি.)-এর পরামর্শে হযরত আবু বকর (রাযি.) সম্পূর্ণ কুরআন একস্থানে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন এবং কপিটি নিজের কাছে সংরক্ষণ করেন। ইতিহাসে কুরআনের এ আদি কপিটি মাসহাফে সিদ্দীকী নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে হযরত উসমান (রাযি.)-এর যুগে কুরআনের যে কপিগুলো করা হয় তা মূলত মাসহাফে সিদ্দীকীর অনুলিপি মাত্র।[১]

ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা

পবিত্র কুরআন ও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বাণীতে হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর সীমাহীন মর্যাদা ও সম্মানের কথা বহুবার বহু স্থানে ঘোষিত হয়েছে। হযরত আবু বকর (রাযি.) রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) *তাযকিরাতুল হুফফায* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। অত্যধিক সতর্কতার কারণে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা অন্যদের তুলনায় খুব কম।

হযরত ওমর (রাযি.), হযরত উসমান (রাযি.), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.), হযরত হুযাইফা (রাযি.), হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাযি.), হযরত উকবা (রাযি.), হযরত মা'কাল (রাযি.), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.), হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.), হযরত আবু উমামা (রাযি.), হযরত আবু বারাযা (রাযি.), হযরত আবু মুসা (রাযি.), তাঁর দু'কন্যা হযরত আয়িশা (রাযি.) ও হযরত আসমা (রাযি.) প্রমুখ সাহাবী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। বিশিষ্ট তাবেয়ীরাও তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন।

[১] শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, *সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম*, খ. ১, পৃ. ৪৩

ওফাত

১৩ হিজরীর ৭ জমাদিউল উখরা হযরত আবু বকর (রাযি.) জ্বরে আক্রান্ত হন। ১৫ দিন রোগাক্রান্ত থাকার পর হিজরী ১৩ সনের ২১ জামাদিউল উখরা মোতাবেক ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে ইনতিকাল করেন। হযরত আয়িশার (রাযি.) হুজরায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পাশে একটু পূর্ব দিকে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি দু'বছর তিন মাস দশ দিন খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট, তিনি আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট।

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)

নাম-নসব ও বংশ

নাম: ওমর, লকব: ফারুক এবং কুনিয়াত: আবু হাফ্স। পিতা: খাত্তাব ও মাতা: হানতামা। কুরাইশ বংশের আ'দী গোত্রের লোক। হযরত ওমর (রাযি.)-এর অষ্টম উর্ধপুরুষ কা'ব নামক ব্যক্তির মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। পিতা খাত্তাব কুরাইশ বংশের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। মাতা হানতামা' কুরাইশবংশের বিখ্যাত সেনাপতি হিশাম ইবনে মুগীরার কন্যা। ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.) এ মুগীরার পৌত্র। মক্কার জাবালে আকিবের পাদদেশে ছিল জাহিলী যুগে বনি আ'দী ইবনে কা'বের বসতি। এখানেই ছিল হযরত ওমর (রাযি.)-এর বাসস্থান। ইসলামি যুগে ওমর (রাযি.)-এর নাম অনুসারে পাহাড়টির নাম হয় জাবালে ওমর বা হযরত ওমর (রাযি.)-এর পাহাড়।[১]

হযরত ওমর (রাযি.)-এর চাচাতো ভাই

হযরত ওমর (রাযি.)-এর চাচাত ভাই যায়েদ ইবনে নুফাইল। হযরত রাসুলে করীম (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে নিজেদের বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে জাহিলী আরবে যাঁরা তাওহীদবাদী হয়েছিলেন হযরত যায়েদ (রাযি.) তাঁদেরই একজন।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর জন্ম

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্মের তের বছর পর তাঁর জন্ম। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বয়সের সমান ৬৩ বছর। তবে তাঁর জন্ম ও ইসলাম গ্রহণের সন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২৪৬, হাদীস: ৩৭৭৬

গায়ের রং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, টাক মাথা, গণ্ডদেশ মাংসহীন, ঘন দাড়ি, মোঁচের দু'পাশ লম্বা ও পুরু এবং শরীর দীর্ঘাকৃতির। হাজার মানুষের মধ্যেও তাঁকেই সবার থেকে লম্বা দেখা যেত।

তাঁর জন্ম ও বাল্য সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। হাফিয ইবনে আসাকির তাঁর *তারিখে দিমাশকে* হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) হতে একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। তাতে জানা যায়, একদিন আমর ইবনুল আস কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবসহ বসে আছেন, এমন সময় হৈ-চৈ শুনতে পেলেন। সংবাদ নিয়ে জানতে পেলেন, খাত্তাবের একটি ছেলে হয়েছে। এ বর্ণনার ভিত্তিতে মনে হয়, হযরত ওমর (রাযি.)-এর জন্মের সময় বেশ একটা আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১]

হযরত ওমর (রাযি.)-এর যৌবন

তাঁর যৌবনের অবস্থাটাও প্রায় অনেকটা অজ্ঞাত। কে জানতো যে, এ সাধারণ একরোখা ধরনের যুবকটি একদিন ফারুকে আযমে পরিণত হবেন। কৈশোরে হযরত ওমর (রাযি.)-এর পিতা তাঁকে উটের রাখালী কাজে লাগিয়ে দেন। তিনি মক্কার নিকটবর্তী যাজনান নামক স্থানে উট চরাতেন। তিনি তাঁর খিলাফতকালে একবার এ মাঠ অতিক্রমকালে সঙ্গীদের কাছে বাল্যের স্মৃতিচারণ করেছিলেন এভাবে,

لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ فِيْ هَذَا الْمَكَانِ وَأَنَا فِيْ إِبِلٍ لِلْخَطَّابِ، وَكَانَ فَظًّا غَلِيْظًا، أَحْتَطِبُ عَلَيْهَا مَرَّةً، وَأَخْتَبِطُ عَلَيْهَا أُخْرَىٰ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ الْيَوْمَ يَضْرِبُ النَّاسُ بِجَنَبَاتِيْ.

'এমন একসময় ছিল যখন আমি পশমী জামা পরে এ মাঠে প্রখর রোদে খাত্তাবের উট চরাতাম। খাত্তাব ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও নীরস ব্যক্তি। ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রাম নিলে পিতার হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হতাম। কিন্তু আজ আমার এমন দিন এসেছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আমার ওপর কর্তৃত্ব করার আর কেউ নেই।'[২]

যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি তৎকালীন অভিজাত আরবদের অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ যথা– যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা ও বংশতালিকা শিক্ষা প্রভৃতি আয়ত্ত

[১] ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ৪৬, পৃ. ১১৭–১১৮

[২] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২৪৭, হাদীস: ৩৭৭৮

করেন। বংশতালিকা বা নসবনামা বিদ্যা তিনি লাভ করেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়ে ছিলেন এ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর। আরবের উকায মেলায় তিনি কুস্তি লড়তেন।

কবি নাবিগা আয-যুবইয়ানী বলেছেন, হযরত ওমর (রাযি.) ছিলেন এক মস্তবড় পাহলোয়ান। তিনি ছিলেন জাহিলী আরবের এক বিখ্যাত ঘোড় সওয়ার। সাহিত্যিক ওমর আল-জাহিয বলেছেন,

'হযরত ওমর (রাযি.) ঘোড়ায় চড়লে মনে হত, ঘোড়ার চামড়ার সাথে তাঁর শরীর মিশে গেছে।'[১]

তাঁর মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। তৎকালীন খ্যাতনামা কবিদের প্রায় সব কবিতাই তাঁর মুখস্থ ছিল। আরবি কাব্য সমালোচনার বিজ্ঞান ভিত্তিক ধারার প্রতিষ্ঠাতা প্রকৃতপক্ষে তিনিই। ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতামতগুলো পাঠ করলে এ বিষয়ে তাঁর যে কতখানি দখল ছিল তা উপলব্ধি করা যায়। বাগ্মিতা ছিল তাঁর সহজাত গুণ। যৌবনে তিনি কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন।

ঐতিহাসিক আহমদ আল-বালাযুরী লিখেছেন,

'রাসুলে করীম (সা.)-এর নুবুওয়াতপ্রাপ্তির সময় গোটা কুরাইশবংশে মাত্র সতেরজন লেখা-পড়া জানতেন। তাঁদের মধ্যে হযরত ওমর (রাযি.) একজন।'[২]

ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল জাহিলী যুগের আরবজাতির সম্মানজনক পেশা। হযরত ওমর (রাযি.)ও ব্যবসা শুরু করেন এবং তাতে যথেষ্ট উন্নতিও করেন। ব্যবসা উপলক্ষে অনেক দূরদেশে গমন এবং বহু জ্ঞানী-গুণী সমাজের সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেন।

আবুল হাসান আল-মাসউদী বলেন,

وَلِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَخْبَارٌ كَثِيْرَةٌ فِيْ أَسْفَارِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِلَى الشَّامِ وَالْعِرَاقِ مَعَ كَثِيْرٍ مِّنْ مُلُوْكِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ.

'হযরত ওমর (রাযি.) জাহিলী যুগে সিরিয়া ও ইরাকে ব্যবসা উপলক্ষে ভ্রমণে যেতেন। ফলে আরব ও আজমের অনেক রাজা-বাদশার সাথে মেলামেশার সুযোগ লাভ করেন।'[১]

[১] আল-জাহিয, ***আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন***, খ. ৩, পৃ. ১৭

[২] আল-বালাযূরী, ***ফুতূহুল বুলদান***, পৃ. ৪৫৩

আল্লামা শিবলী নু'মানী (রহ.) বলেন,

'জাহিলী যুগেই ওমর (রাযি.)-এর সুনাম সমগ্র আরবে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ কারণে কুরাইশরা সর্বদা তাঁকেই দৌত্যগিরিতে নিয়োগ করতো। অন্যান্য গোত্রের সাথে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হলে নিষ্পত্তির জন্য তাঁকেই দূত হিসেবে পাঠানো হত।'[২]

হযরত ওমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ

হযরত ওমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ এক চিত্তাকর্ষক ঘটনা। তাঁর চাচাত ভাই যায়েদের কল্যাণে তাঁর বংশে তাওহীদের বাণী একেবারে নতুন ছিল না। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম যায়েদের পুত্র হযরত সাঈদ (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাযি.) হযরত ওমর (রাযি.)-এর বোন হযরত ফাতিমা (রাযি.)-কে বিয়ে করেন। স্বামীর সাথে হযরত ফাতিমা (রাযি.)ও ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রাযি.)-এর বংশের আর এক বিশিষ্ট ব্যক্তি হযরত নাঈম ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.)ও ইসলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত হযরত ওমর (রাযি.) ইসলাম সম্পর্কে কোনো খবরই রাখতেন না।

তিনি সর্বপ্রথম যখন ইসলামের কথা শুনলেন ক্রোধে জ্বলতে লাগলেন। তাঁর বংশে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের তিনি পরম শত্রু হয়ে দাঁড়ালেন। এর মধ্যে জানতে পেলেন, 'লাবীনা' নামে তাঁর এক দাসীও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যাঁদের ওপর তাঁর ক্ষমতা চলতো, নির্মম উৎপীড়ন চালালেন। এক পর্যায়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, ইসলামের মূল প্রচারক হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বির্ণত, তরবারি কাঁধে ঝুলিয়ে ওমর চলেছেন। পথে বনি যুহরার এক ব্যক্তির (মতান্তরে নাঈম ইবনে আবদুল্লাহ রাযি.) সাথে দেখা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন দিকে? ওমর বললেন, মুহাম্মদের একটা দফা-রফা করতে। লোকটি বললেন, মুহাম্মদের (সা.) দফা-রফা করে বনি হাশিম ও বনি যুহরার হাত থেকে বাঁচবে কিভাবে?

একথা শুনে হযরত ওমর (রাযি.) বলে উঠলেন, মনে হচ্ছে, তুমিও পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে বিধর্মী হয়েছ। লোকটি বললেন, ওমর! একটি

[১] আল-মাসউদী, ***মুরাওয়াজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহর***, খ. ২, পৃ. ৩৩০

[২] শিবলী নু'মানী, ***আল-ফারুক***, পৃ. ৪৪

বিস্ময়কর খবর শোনো, তোমার বোন-ভগ্নিপতি বিধর্মী হয়ে গেছেন। তাঁরা তোমার ধর্ম ত্যাগ করেছেন। (আসলে লোকটির উদ্দেশ্য ছিল, হযরত ওমরকে তাঁর লক্ষ্য থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া।)

একথা শুনে রাগে উন্মত্ত হয়ে ওমর ছুটলেন তাঁর বোন-ভগ্নিপতির বাড়ির দিকে। বাড়ির দরজায় হযরত ওমর (রাযি.)-এর করাঘাত পড়লো। তাঁরা দু'জন তখন হযরত খাব্বাব ইবনে আল-আরাত (রাযি.)-এর কাছে কুরআন শিখছিলেন। হযরত ওমর (রাযি.)-এর আভাস পেয়ে হযরত খাব্বাব (রাযি.) বাড়ির অন্য একটি ঘরে আত্মগোপন করলেন। হযরত ওমর (রাযি.) বোন-ভগ্নিপতিকে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের এখানে গুণগুণ আওয়ায শুনছিলাম, তা কিসের?

তাঁরা তখন কুরআনের সুরা তাহা পাঠ করছিলেন। তাঁরা উত্তর দিলেন, আমরা নিজেদের মধ্যে কথা-বার্তা বলছিলাম। ওমর বললেন, সম্ভবত তোমরা দু'জন ধর্মত্যাগী হয়েছো। ভগ্নিপতি বললেন, তোমার ধর্ম ছাড়া অন্য কোথাও যদি সত্য থাকে তুমি কি করবে ওমর? হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর ভগ্নিপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং দু'পায়ে ভীষণভাবে তাঁকে মাড়াতে লাগলেন। বোন তাঁর স্বামীকে বাঁচাতে এলে ওমর তাঁকে ধরে এমন মার দিলেন যে, তাঁর মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেল। বোন রাগে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, সত্য যদি তোমার দীনের বাইরে অন্য কোথাও থেকে থাকে তাহলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল।

এ ঘটনার কিছুদিন আগ থেকে হযরত ওমর (রাযি.)-এর মধ্যে একটা ভাবান্তর সৃষ্টি হয়েছিল। কুরাইশরা মক্কায় মুসলমানদের ওপর নির্মম অত্যাচার-উৎপীড়ন চালিয়ে একজনকে ফেরাতে পারেনি। মুসলমানরা নীরবে সবকিছু মাথা পেতে নিয়েছে। প্রয়োজনে বাড়ি-ঘর ছেড়েছে, ইসলাম ত্যাগ করেনি। এতে হযরত ওমর (রাযি.)-এর মনে একটা ধাক্কা লেগেছিল। তিনি একটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের আবর্তে দোল খাচ্ছিলেন। আজ তাঁর প্রিয় সহোদরার চোখ-মুখের রক্ত, তার সত্যের সাক্ষ্য তাঁকে এমন একটি ধাক্কা দিল যে, তাঁর সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কর্পুরের মতো উড়ে গেল। মুহূর্তে হৃদয় তাঁর সত্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

তিনি পাক-সাফ হয়ে বোনের হাত থেকে সুরা তাহা-এর অংশটুকু নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। পড়া শেষ করে বললেন, আমাকে তোমরা হযরত

মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছে নিয়ে চল। হযরত ওমর (রাযি.)-এর একথা শুনে এতক্ষণে খাব্বাব ঘরের গোপন স্থান থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'সুসংবাদ ওমর! বৃহস্পতিবার রাতে রাসুলুল্লাহ (সা.) তোমার জন্য দুআ করেছিলেন। আমি আশা করি তা কবুল হয়েছে। তিনি বলেছিলেন,

«اللّٰهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِعُمَرَ بْنِ الْـخَطَّابِ، أَوْ بِعَمْرِو بْنِ هِشَامٍ».

'আল্লাহ! ওমর ইবনুল খাত্তাব অথবা আমর ইবনে হিশামের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী কর।'

খাব্বাব আরও বললেন, রাসুল (সা.) এখন সাফার পাদদেশে দারুল আরকামে আছেন। হযরত ওমর চললেন দারুল আরকামের দিকে। হযরত হামযা (রাযি.) ও হযরত তালহা (রাযি.)-এর সাথে আরও কিছু সাহাবী তখন আরকামের বাড়ির দরজায় পাহারারত। হযরত ওমর (রাযি.)-কে দেখে তাঁরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তবে হামযা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আল্লাহ হযরত ওমর (রাযি.)-এর কল্যাণ চাইলে সে ইসলাম গ্রহণ করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসারী হবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা আমাদের জন্য খুবই সহজ হবে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বাড়ির ভেতরে। তাঁর ওপর তখন ওহী নাযিল হচ্ছে।

একটু পরে তিনি বেরিয়ে হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাছে এলেন। হযরত ওমর (রাযি.)-এর কাপড় ও তরবারির হাতল মুট করে ধরে বললেন, 'ওমর! তুমি কি বিরত হবে না?' .... তারপর দুআ করলেন,

«اللّٰهُمَّ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْـخَطَّابِ، اللّٰهُمَّ أَعِزَّ الدِّينَ بِعُمَرَ بْنِ الْـخَطَّابِ».

'হে আল্লাহ! ওমর আমার সামনে, হে আল্লাহ! ওমরের দ্বারা দীনকে শক্তিশালী কর।'

হযরত ওমর (রাযি.) বলে উঠলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর রাসুল। ইসলাম গ্রহণ করেই তিনি আহ্বান জানালেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, ঘর থেকে বের হয়ে পড়ুন।'[১]

এটা নুবুওয়াতের ষষ্ঠ বছরের ঘটনা। ইমাম শিহাব আয-যুহরী (রহ.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) দারুল আরকামে প্রবেশের পর ওমর ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পূর্বে নারী-পুরুষ সর্বমোট ৪০ অথবা চল্লিশের কিছু

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২৪৮, হাদীস: ৩৭৮২

বেশি লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ওমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর হযরত জিবরীল (আ.) এসে বলেন,

يَا مُحَمَّدُ! لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عُمَرَ.

'হে মুহাম্মদ! ওমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণে আসমানের অধিবাসীরা উৎফুল্ল হয়েছে।'[১]

হযরত ওমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। যদিও তখন পর্যন্ত ৪০/৫০ জন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে হযরত হামযা (রাযি.)ও ছিলেন, তা সত্ত্বেও মুসলমানদের পক্ষে কাবায় গিয়ে নামায পড়া তো দূরের কথা নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করাও নিরাপদ ছিল না। হযরত ওমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে এ অবস্থার পরিবর্তন হলো। তিনি প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিলেন এবং অন্যদের সঙ্গে নিয়ে কাবা ঘরে নামায আদায় শুরু করলেন।

হযরত ওমর (রাযি.) বলেন,

لَمَّا أَسْلَمْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، تَذَكَّرْتُ أَيَّ أَهْلِ مَكَّةَ أَشَدُّ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَدَاوَةً حَتَّىٰ آتِيَهُ فَأُخْبِرَهُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ، قَالَ: قُلْتُ: أَبُوْ جَهْلٍ- وَكَانَ عُمَرُ لِحَتْمَةَ بِنْتِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ- قَالَ: فَأَقْبَلْتُ حِيْنَ أَصْبَحْتُ حَتَّىٰ ضَرَبْتُ عَلَيْهِ بَابَهُ. قَالَ: فَخَرَجَ إِلَيَّ أَبُوْ جَهْلٍ، فَقَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِابْنِ أُخْتِيْ، مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: جِئْتُ لِأُخْبِرَكَ أَنِّيْ قَدْ آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ، وَصَدَّقْتُ بِمَا جَاءَ بِهِ، قَالَ: فَضَرَبَ الْبَابَ فِيْ وَجْهِي وَقَالَ: قَبَّحَكَ اللهُ، وَقَبَّحَ مَا جِئْتَ بِهِ.

'আমি ইসলাম গ্রহণের পর সেই রাতেই চিন্তা করলাম, মক্কাবাসীদের মধ্যে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সবচেয়ে কট্টর দুশমন কে আছে। আমি নিজে গিয়ে তাকে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা জানাবো। আমি মনে করলাম, আবু জাহলই সবচেয়ে বড় দুশমন। সকাল হতেই আমি তার দরজায় করাঘাত করলাম। আবু জাহল বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, কি মনে করে? আমি বললাম, আপনাকে একথা জানাতে এসেছি যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর আনীত বিধান ও বাণীকে মেনে নিয়েছি। একথা শোনামাত্র সে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল এবং বললো, আল্লাহ তোকে কলংকিত করুক এবং যে খবর নিয়ে তুই এসেছিস তাকেও কলংকিত করুক।'[১]

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২৪৯, হাদীস: ৩৭৮৩

এভাবে এ প্রথমবারের মতো মক্কার পৌত্তলিক শক্তি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলো। হযরত সাঈদ ইনবুল মুসাইয়িব (রহ.) বলেন,

فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ أَسْلَمَ عُمَرُ فَظَهَرَ الْإِسْلَامُ بِمَكَّةَ.

'তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর মক্কায় ইসলাম প্রকাশ্য রূপ নেয়।'[২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন,

فَلَمَّا أَسْلَمَ قَاتَلَ قُرَيْشًا حَتَّىٰ صَلَّىٰ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، وَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

'হযরত ওমর (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করেই কুরাইশদের সাথে বিবাদ আরম্ভ করে দিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কাবায় নামায পড়ে ছাড়লেন। আমরাও সকলে তাঁর সাথে নামায পড়েছিলাম।'[৩]

হযরত সুহায়িব ইবনে সিনান (রহ.) বলেন,

لَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَدُعِيَ إِلَيْهِ عَلَانِيَةً، وَجَلَسْنَا حَوْلَ الْبَيْتِ حِلَقًا وَطُفْنَا بِالْبَيْتِ، وَانْتَصَفْنَا مِمَّنْ غَلُظَ عَلَيْنَا، وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ بَعْضَ مَا يَأْتِيْ بِهِ.

'তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর আমরা কাবার পাশে জটলা করে বসতাম, কাবার তাওয়াফ করতাম, আমাদের সাথে কেউ রূঢ় ব্যবহার করলে তার প্রতিশোধ নিতাম এবং আমাদের ওপর যেকোনো আক্রমণ প্রতিহত করতাম।'[৪]

তাই রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে আল-ফারুক উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। কারণ তাঁরই কারণে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে প্রকাশ্য বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। রাসুললুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

[১] ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়া*, খ. ১, পৃ. ৩৫০
[২] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২৪৯, হাদীস: ৩৭৮৪
[৩] ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়া*, খ. ১, পৃ. ৩৪২
[৪] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২৪৯, হাদীস: ৩৭৮৫

إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْـحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ، وَهُوَ الْفَـارُوْقُ ، فَـرَّقَ اللهُ بِـهِ بَـيْنَ الْـحَقِّ وَالْبَاطِلِ.

'ওমরের জিহ্বা ও অন্তঃকরণে আল্লাহ তাআলা সত্যকে স্থায়ী করে দিয়েছেন। তাই সে ফারুক। আল্লাহ তাঁর দ্বারা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছেন।'[১]

হযরত ওমর (রাযি.)-এর হিজরত

মক্কায় যাঁরা মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদেরকে মদীনায় হিজরতের নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু সালামা আবদুল্লাহ ইবনুল আশহাল (রাযি.), হযরত বিলাল (রাযি.) ও হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযি.)-এর মদীনায় হিজরতের পর বিশজন আত্মীয়-বন্ধুসহ হযরত ওমর (রাযি.) মদীনার দিকে পা বাড়ালেন। এ বিশজনের মধ্যে তাঁর ভাই হযরত যায়েদ ইবনুল খাত্তাব (রাযি.), ভাইয়ের ছেলে হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) ও জামাই হযরত খুনাইস ইবনে হুযাফা (রাযি.)ও ছিলেন। মদীনার উপকণ্ঠে কুবা পল্লীতে তাঁরা হযরত রিফাআ ইবনে আবদুল মুনযির (রাযি.)-এর বাড়িতে আশ্রয় নেন।[২]

হযরত ওমর (রাযি.)-এর হিজরত ও অন্যদের হিজরতের মধ্যে একটা বিশেষ পার্থক্য ছিল। অন্যদের হিজরত ছিল চুপে চুপে। সকলের অগোচরে। আর হযরত ওমর (রাযি.)-এর হিজরত ছিল প্রকাশ্যে। তাঁর মধ্যে ছিল কুরাইশদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ও বিদ্রোহের সুর। মক্কা থেকে মদীনায় যাত্রার পূর্বে তিনি প্রথমে কাবা তাওয়াফ করলেন। তারপর কুরাইশদের আড্ডায় গিয়ে ঘোষণা করলেন,

مَنْ أَرَادَ أَنْ تَثْكَلَهُ أُمُّهُ، فَلْيَلْقَنِي وَرَاءَ هَذَا الْوَادِيْ.

'আমি মদীনায় চলছি। কেউ যদি তার মাকে পুত্রশোক দিতে চায় সে যেন এ উপত্যকার অপর প্রান্তে আমার মুখোমুখি হয়।'[৩]

এমন একটি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে তিনি সোজা মদীনার পথ ধরলেন। কিন্তু কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দুঃসাহস করলো না।[১]

---

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২৫১, হাদীস: ৩৭৯১, হযরত আইয়ুব ইবনে মুসা (রহ.) থেকে বর্ণিত

[২] শিবলী নু'মানী, *আল-ফারুক*, পৃ. ৪৭–৪৮

[৩] ইবনে আসাকির, *তারীখু দামিশক*, খ. ৪৪, পৃ. ৫২

হযরত ওমর (রাযি.)-এর ভ্রাতৃত্ব

বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, রাসুলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন সময় বিভিন্নজনের সাথে হযরত ওমর (রাযি.)-এর দীনী ভ্রাতৃ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে দেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.), হযরত উয়াইম ইবনে সায়িদা (রাযি.), হযরত ইতবান ইবনে মালিক (রাযি.) ও হযরত মুআয ইবনে আফরা (রাযি.) ছিলেন হযরত ওমর (রাযি.)-এর দীনী ভাই। তবে এটা নিশ্চিত যে, মদীনায় হিজরতের পর বনি সালেমের সরদার হযরত ইতবান ইবনে মালিক (রাযি.)-এর সাথে তাঁর দীনী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[২]

যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হিজরী প্রথম বছর হতে রাসুলে করীম (সা.)-এর ইনতিকাল পর্যন্ত হযরত ওমর (রাযি.)-এর কর্মজীবন প্রকৃতপক্ষে হযরত রাসুলে করীম (সা.)-এর কর্মময় জীবনেরই একটা অংশবিশেষ। রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে যত যুদ্ধ করতে হয়েছিল, যত চুক্তি করতে হয়েছিল কিংবা সময় সময় যত বিধি-বিধান প্রবর্তন করতে হয়েছিল এবং ইসলাম প্রচারের জন্য যত পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল তার এমন একটি ঘটনাও নেই যা হযরত ওমর (রাযি.)-এর সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতীত সম্পাদিত হয়েছে। এজন্য এসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিখতে গেলে তা হযরত ওমর (রাযি.)-এর জীবনী না হয়ে হযরত রাসুল করীম (সা.)-এর জীবনীতে পরিণত হয়। তাঁর কর্মবহুল জীবন ছিল রাসুল করীম (সা.)-এর জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

হযরত ওমর (রাযি.) বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া আরও বেশ কিছু সারিয়া (যেসব ছোট অভিযানে রাসুলুল্লাহ সা. নিজে উপস্থিত হননি)-এ তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের পরামর্শদান ও সৈন্যচালনা হতে আরম্ভ করে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি রাসুলে করীম (সা.)-এর সাথে দৃঢ়ভাবে কাজ করেন। বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে তাঁর পরামর্শই আল্লাহর পসন্দসই হয়েছিল। এ যুদ্ধে তাঁর বিশেষ ভূমিকা নিম্নরূপ:

১. এ যুদ্ধে কুরাইশ বংশের প্রত্যেক শাখা হতে লোক যোগদান করে; কিন্তু বনি আ'দী অর্থাৎ হযরত ওমর (রাযি.)-এর খান্দান হতে একটি লোকও যোগদান করেনি। হযরত ওমর (রাযি.)-এর প্রভাবেই এমনটি হয়েছিল।

---

[১] মুহাম্মদ আল-খিযরী বেগ, *মুহাযারাতু তারিখিল উম্মাহ আল-ইসলামিয়া*, পৃ. ২৬৯

[২] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২৫২, হাদীস: ৩৭৯৪–৩৭৯৬

২. এ যুদ্ধে ইসলামের বিপক্ষে হযরত ওমর (রাযি.)-এর সাথে তাঁর গোত্রও চুক্তিবদ্ধ লোকদের থেকে মোট বারোজন লোক যোগদান করেছিল।

৩. এ যুদ্ধে হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর আপন মামা আসী ইবনে হিশাম ইবনুল মুগীরাকে নিজ হাতে হত্যা করেন। এ হত্যার মাধ্যমে তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন, সত্যের পথে আত্মীয় প্রিয়জনের প্রভাব প্রাধান্য লাভ করতে পারে না।[১]

উহুদ যুদ্ধেও হযরত ওমর (রাযি.) ছিলেন একজন অগ্রসৈনিক। যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম সৈন্যরা যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) আহত হয়ে মুষ্টিমেয় কিছু সঙ্গী-সাথীসহ পাহাড়ের এক নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিলেন তখন কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ান নিকটবর্তী হয়ে উচ্চৈঃস্বরে হযরত মুহাম্মদ (সা.), হযরত আবু বকর (রাযি.) ও হযরত ওমর (রাযি.) প্রমুখের নাম ধরে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা বেঁচে আছ কি? রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইঙ্গিতে কেউই আবু সুফিয়ানের জবাব দিল, 'না।' কোনো সাড়া না পেয়ে আবু সুফিয়ান ঘোষণা করলো, 'নিশ্চয় তারা সকলে নিহত হয়েছে।'

একথায় হযরত ওমর (রাযি.)-এর পৌরুষে আঘাত লাগলো। তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি বলে উঠলেন, 'ওরে আল্লাহর দুশমন! আমরা সবাই জীবিত।' আবু সুফিয়ান বললো, أُعْلُ هُبَلُ (হুবলের জয় হোক)। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইঙ্গিতে ওমর জবাব দিলেন, اللهُ أَعْلَىٰ وَأَجَلُّ (আল্লাহ মহান ও সম্মানী)।[২]

খন্দকের যুদ্ধেও হযরত ওমর (রাযি.) সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। খন্দকের একটি বিশেষ স্থান রক্ষা করার ভার পড়েছিল হযরত ওমর (রাযি.)-এর ওপর। আজও সেখানে তাঁর নামে একটি মসজিদ বিদ্যমান থেকে তাঁর সেই স্মৃতির ঘোষণা করছে। এ যুদ্ধে একদিন তিনি প্রতিরক্ষায় এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তাঁর আসরের নামায ফউত (কাযা) হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন,

وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا.

[১] শিবলী নু'মানী, *আল-ফারুক*, পৃ. ৫২

[২] (ক) ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়া*, খ. ২, পৃ. ৯৩; (খ) শিবলী নু'মানী, *আল-ফারুক*, পৃ. ৫৭–৫৮

'ব্যস্ততার কারণে আমিও এখন পর্যন্ত নামায আদায় করতে পারিনি।'[১]

হুদাইবিয়ার শপথের পূর্বেই হযরত ওমর (রাযি.) যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিলেন। পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.)-কে পাঠালেন কোনো এক আনসারীর নিকট থেকে ঘোড়া আনার জন্য। তিনি এসে খবর দিলেন, 'লোকেরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে বায়আত করছেন। হযরত ওমর (রাযি.) তখন রণসজ্জায় সজ্জিত। এ অবস্থায় দৌড়ে গিয়ে তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে বায়আত করেন।[২]

হুদাইবিয়ার সন্ধির শর্তসমূহ বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের জন্য অপমানজনক মনে হলো। হযরত ওমর (রাযি.) উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। প্রথমে হযরত আবু বকর (রাযি.), তারপর খোদ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এ সন্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন,

«أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ لَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِيْ».

'আমি আল্লাহর রাসুল। আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কোনো কাজ আমি করি না।'

হযরত ওমর শান্ত হলেন। তিনি অনুতপ্ত হলেন। নফল রোযা রেখে, নামায পড়ে, গোলাম আযাদ করে এবং দান-খয়রাত করে তিনি গোস্তাখির কাফ্‌ফারা আদায় করলেন।[৩]

খায়বারে ইহুদিদের অনেকগুলো সুরক্ষিত দুর্গ ছিলো। কয়েকটি সহজেই জয় হলো। কিন্তু দুটি কিছুতেই জয় করা গেল না। রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রথম দিন হযরত আবু বকর (রাযি.), দ্বিতীয় দিন হযরত ওমর (রাযি.)-কে পাঠালেন দুর্গ দুটি জয় করার জন্য। তাঁরা দু'জনই ফিরে এলেন অকৃতকার্য হয়ে। তৃতীয় দিন রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করলেন,

«لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ».

[১] (ক) আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ১১১, হাদীস: ৪১১২, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) থেকে বর্ণিত; (খ) শিবলী নু'মানী, *আল-ফারুক*, পৃ. ৫৯

[২] শিবলী নু'মানী, *আল-ফারুক*, পৃ. ৬০

[৩] (ক) ইবনে জরীর আত-তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক = তারীখুত তাবারী*, খ. ২, পৃ. ৬৩৩–৬৩৪; (খ) শিবলী নু'মানী, *আল-ফারুক*, পৃ. ৬১

'আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা দেব, যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালবাসেন, তাঁর হাতেই আল্লাহ বিজয় দান করবেন।'[১]

পরদিন সাহাবায়ে কেরাম অস্ত্র সজ্জিত হয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হাজির। প্রত্যেকেরই অন্তরে এ গৌরব অর্জনের বাসনা। হযরত ওমর (রাযি.) বলেন,

مَا أَحْبَبْتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ.

'আমি খায়বারের এ ঘটনা ব্যতীত কোনোদিনই সেনাপতিত্ব বা সরদারির জন্য লালায়িত হইনি।'[২]

সে দিনের এ গৌরব ছিনিয়ে নিয়েছিলেন শেরে খোদা আলী (রাযি.)। খায়বারের বিজিত ভূমি মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর ভাগ্যের অংশটুকু আল্লাহর রাস্তার ওয়াক্‌ফ করে দিলেন। ইসলামের ইতিহাসে এটিই প্রথম ওয়াক্‌ফ।[৩]

মক্কাবিজয়ের সময় হযরত ওমর (রাযি.) ছায়ার মতো রাসুল (সা.)-কে সঙ্গ দেন। ইসলামের মহাশত্রু আবু সুফিয়ান আত্মসমর্পণ করতে এলে হযরত ওমর (রাযি.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে অনুরোধ করেন, অনুমতি দিন এখনই ওর দফা শেষ করে দিই। এদিন মক্কার পুরুষরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে এবং মহিলারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে হযরত ওমর (রাযি.)-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করছিলেন।[৪]

হুনাইন অভিযানেও হযরত ওমর অংশগ্রহণ করে বীরত্ব সহকারে লড়াই করেছিলেন। এ যুদ্ধে কাফিরদের তীব্র আক্রমণে বারো হাজার মুসলিম বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন, মুহাজির ও আনসারদের মাত্র কয়েকজন বীরই এ বিপদকালে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে দৃঢ়পদ ছিলেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাযি.), হযরত ওমর (রাযি.) ও হযরত আব্বাস (রাযি.)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৫]

---

[১] (ক) ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়া*, খ. ২, পৃ. ৩৩৪; (খ) ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৪, পৃ. ২১২

[২] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৮৭১, হাদীস: ২৪০৫

[৩] (ক) মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১২৫৫, হাদীস: ১৬৩২; (খ) শিবলী নু'মানী, *আল-ফারুক*, পৃ. ৬৩

[৪] শিবলী নু'মানী, *আল-ফারুক*, পৃ. ৬৪–৬৫

[৫] (ক) ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়া*, খ. ২, পৃ. ৪৪৩; (খ) শিবলী নু'মানী, *আল-ফারুক*, পৃ. ৬৫

তাবুক অভিযানের সময় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আবেদনে সাড়া দিয়ে হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর মোট সম্পদের অর্ধেক রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে তুলে দেন।

খিলাফত লাভ

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতিকালের খবর শুনে হযরত ওমর কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকেন। তারপর মসজিদে নববীর সামনে যেয়ে তরবারি কোষমুক্ত করে ঘোষণা করেন, 'যে বলবে রাসুলুল্লাহ (সা.) ইনতিকাল করেছেন, আমি তার মাথা দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবো।' এ ঘটনা থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালবাসার পরিমাণ সহজেই অনুমান করা যায়।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতিকালের পর সাকীফা বনি সায়িদায় দীর্ঘ আলোচনার পর ওমর (রাযি.) খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন। ফলে খলীফা নির্বাচনের মহা সংকট সহজেই কেটে যায়।

খলীফা হযরত আবু বকর (রাযি.) যখন বুঝতে পারলেন তাঁর অন্তিম সময় ঘনিয়ে এসেছে, মৃত্যুর পূর্বেই পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে যাওয়াকে তিনি কল্যাণকর মনে করলেন। তাঁর দৃষ্টিতে হযরত ওমর (রাযি.) ছিলেন খিলাফতের যোগ্যতম ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও উঁচু পর্যায়ের সাহাবায়ে কেরামের সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করা সমীচীন মনে করলেন। তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.)-কে ডেকে বললেন, 'ওমর সম্পর্কে আপনার মতামত আমাকে জানান।' তিনি বললেন, 'তিনি তো যেকোনো লোক থেকে উত্তম, কিন্তু তাঁর চরিত্রে কিছু কঠোরতা আছে।' হযরত আবু বকর (রাযি.) বললেন, 'তার কারণ আমাকে তিনি কোমল দেখেছেন, খিলাফতের দায়িত্ব কাঁধে পড়লে এ কঠোরতা অনেকটা কমে যাবে।'

তারপর হযরত আবু বকর (রাযি.) অনুরোধ করলেন, তাঁর সাথে আলোচিত বিষয়টি কারো কাছে ফাঁস না করার জন্য। অতঃপর তিনি হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাযি.)-কে ডাকলেন। বললেন, 'আবু আবদুল্লাহ! ওমর সম্পর্কে আপনার মতামত আমাকে জানান।' হযরত উসমান (রাযি.) বললেন, 'আমার থেকে আপনিই তাঁকে বেশি জানেন।' হযরত আবু বকর (রাযি.) বললেন, 'তা সত্ত্বেও আপনার মতামত আমাকে জানান।' হযরত উসমান (রাযি.) বললেন, 'তাঁকে আমি যতটুকু জানি তাতে তাঁর বাইরের

থেকে ভেতরটা বেশি ভালো। তাঁর মতো দ্বিতীয় আর কেউ আমাদের মধ্যে নেই।'

হযরত আবু বকর (রাযি.) তাঁদের দু'জনের মধ্যে আলোচিত বিষয়টি গোপন রাখার অনুরোধ করে তাঁকে বিদায় দিলেন। এভাবে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে মতামত নেওয়া শেষ হলে তিনি হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাযি.)-কে ডেকে সিদ্ধান্ত দিলেন,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، هَذَا مَا عَهِدَ أَبُوْ بَكْرِ بْنُ أَبِيْ قُحَافَةَ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ!

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। এটা আবু বকর ইবনে আবু কুহাফার পক্ষ থেকে মুসলমানদের প্রতি অঙ্গীকার। আম্মা বাদ!...।'

এতটুকু বলার পর তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। তারপর হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাযি.) নিজেই সংযোজন করেন,

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدِ اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْكُمْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَلَمْ آلُكُمْ خَيْرًا مِّنْهُ.

'আমি তোমাদের জন্য ওমর ইবনুল খাত্তাবকে খলীফা মনোনীত করলাম এবং এ ব্যাপারে তোমাদের কল্যাণ চেষ্টায় কোনো ত্রুটি করিনি।'

অতঃপর হযরত আবু বকর (রাযি.) সংজ্ঞা ফিরে পান। লিখিত অংশটুকু তাঁকে পড়ে শোনান হলো। সবটুকু শুনে তিনি আল্লাহু আকবার বলে ওঠেন এবং বলেন, 'আমার ভয় হচ্ছিল, আমি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মারা গেলে লোকেরা মতভেদ সৃষ্টি করবে।' হযরত উসমান (রাযি.)-কে লক্ষ করে তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহ তাআলা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে আপনাকে কল্যাণ দান করুন।'[১]

হাফিয আবু জাফর আত-তাবারী (রহ.) বলেন, অতঃপর হযরত আবু বকর (রাযি.) লোকদের দিকে তাকালেন। তাঁর স্ত্রী হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাযি.) তখন তাঁকে ধরে রেখেছিলেন। সমবেত লোকদের তিনি বলেন,

[১] ইবনে জরীর আত-তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক = তারীখুত তাবারী*, খ. ৩, পৃ. ৪২৯

أَتَرْضَوْنَ بِمَنْ أَسْتَخْلِفُ عَلَيْكُمْ؟ فَإِنِّيْ وَاللهِ مَا آلَوْتُ مِنْ جَهْدِ الرَّأْيِ، وَلَا وَلَّيْتُ ذَا قَرَابَةٍ، وَإِنِّيْ قَدِ اسْتَخْلَفْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَاسْمَعُوْا لَهُ وَأَطِيْعُوْا.

'যে ব্যক্তিকে আমি আপনাদের জন্য মনোনীত করে যাচ্ছি তাঁর প্রতি কি আপনারা সন্তুষ্ট? আল্লাহর কসম, মানুষের মতামত নিতে আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি। আমার কোনো নিকট আত্মীয়কে এ পদে বহাল করিনি। আমি ওমর ইবনুল খাত্তাবকে আপনাদের খলীফা মনোনীত করেছি। আপনারা তাঁর কথা শুনুন, তাঁর আনুগত্য করুন।'[১]

এভাবে ওমর (রাযি.)-এর খিলাফত শুরু হয় হিজরী ১৩ সনের ২২ জামাদিউস সানী মোতাবেক ১৩ আগস্ট ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দ।[২]

শাসন ও বিজয়

হযরত ওমর (রাযি.)-এর রাষ্ট্র শাসনপদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা সম্ভব নয়। দশ বছরের স্বল্প সময়ে গোটা বাইজান্টাইন রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের পতন ঘটান। তাঁর যুগে বিভিন্ন অঞ্চলসহ মোট ১০৩৬টি শহর বিজিত হয়। ইসলামি হুকুমাতের নিয়মতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠা মূলত তাঁর যুগেই হয়। সরকার বা রাষ্ট্রের সকল শাখা তাঁর যুগেই আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর শাসন ও ইনসাফের কথা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে কিংবদন্তির মতো ছড়িয়ে আছে।

হযরত ওমর (রাযি.) প্রথম খলীফা যিনি আমীরুল মুমিনীন উপাধি লাভ করেন। তিনিই সর্বপ্রথম হিজরী সন প্রবর্তন করেন, তারাবীর নামায জামাআতে পড়ার ব্যবস্থা করেন, জনশাসনের জন্য দুর্রা বা ছড়ি ব্যবহার করেন, মদপানে আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন, বহু রাজ্য জয় করেন, নগর পত্তন করেন, সেনাবাহিনীর স্তরভেদ ও বিভিন্ন ব্যাটালিয়ান নির্দিষ্ট করেন, জাতীয় রেজিস্টার বা নাগরিক তালিকা তৈরি করেন, কাযী নিয়োগ করেন এবং রাষ্ট্রকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করেন।

হযরত ওমর (রাযি.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যতম কাতিব (অহী লেখক)। নিজ কন্যা হযরত হাফসা (রাযি.)-কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর

[১] ইবনে জরীর আত-তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক = তারীখুত তাবারী*, খ. ৩, পৃ. ৪২৮

[২] শিবলী নু'মানী, *আল-ফারুক*, পৃ. ৭১–৭৭

সাথে বিয়ে দেন। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) ও হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর মন্ত্রী উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ও পরে ব্যবসা ছিল তাঁর জীবিকার উপায়। খিলাফতের গুরুদায়িত্ব কাঁধে পড়ার পরও কয়েক বছর পর্যন্ত ব্যবসা চালিয়ে যান।

কিন্তু পরে তা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালে হযরত আলী (রাযি.)সহ উঁচু পর্যায়ের সাহাবায়ে কেরাম পরামর্শ করে বায়তুল মাল থেকে বাৎসরিক মাত্র আটশ' দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেন। হিজরী ১৫ সনে বায়তুল মাল থেকে অন্য লোকদের ভাতা নির্ধারিত হলে বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের ভাতার সমান তাঁরও ভাতা ধার্য করা হয় পাঁচ হাজার দিরহাম।

বায়তুল মালের অর্থের ব্যাপারে হযরত ওমর (রাযি.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ইয়াতিমের অর্থের মতো। ইয়াতিমের অভিভাবক যেমন ইয়াতিমের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে। ইয়াতীমের ও নিজের জন্য প্রয়োজন মতো খরচ করতে পারে কিন্তু অপচয় করতে পারে না। প্রয়োজন না হলে ইয়াতিমের সম্পদ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে শুধু হিফাযত করে এবং ইয়াতিম বড় হলে তাকে তার সম্পদ ফিরিয়ে দেয়। বায়তুল মালের প্রতি হযরত ওমর (রাযি.)-এর এ দৃষ্টিভঙ্গিই সর্বদা তাঁর কর্ম ও আচরণে ফুটে উঠেছে।

হযরত ওমর সবসময় একটি দুর্রা বা ছড়ি হাতে নিয়ে চলতেন। শয়তানও তাঁকে দেখে পালাতো। তাই বলে তিনি অত্যাচারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন কঠোর ন্যায়বিচারক। মানুষকে তিনি হৃদয় দিয়ে ভালবাসতেন, মানুষও তাঁকে ভালবাসতো। তাঁর প্রজাপালনের বহু কাহিনি ইতিহাসে পাওয়া যায়।

ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা

হযরত ফারুকে আযম (রাযি.)-এর ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে এত বেশি ইঙ্গিত ও প্রকাশ্য বাণী রয়েছে যে, সংক্ষিপ্ত কোনো প্রবন্ধে তা প্রকাশ করা যাবে না। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.)-এর নিকট তাঁর স্থান অতি উচ্চে। এজন্য বলা হয়েছে, হযরত ওমর (রাযি.)-এর সব মতের সমর্থনেই সর্বদা কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে।

হযরত আলী (রাযি.) মন্তব্য করেছেন,

«خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُوْ بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ».

'নবী (সা.)-এর পর উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাযি.), তারপর হযরত ওমর (রাযি.), তারপর হযরত উসমান (রাযি.)।'[১]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন,

كَانَ إِسْلَامُ عُمَرَ فَتْحًا، وَكَانَتْ هِجْرَتُهُ نَصْرًا، وَكَانَتْ إِمَارَتُهُ رَحْمَةً.

'হযরত ওমর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ ইসলামের বিজয়। তাঁর হিজরত আল্লাহর সাহায্য এবং তাঁর খিলাফত আল্লাহর রহমত।'[২]

হযরত ওমর (রাযি.)-এর যাবতীয় গুণাবলি লক্ষ করেই রাসুলে করীম (সা.) বলেছিলেন,তিরমিযী

«لَوْ كَانَ نَبِيٌّ بَعْدِيْ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ».

'আমার পরে কেউ নবী হলে ওমরই হতো।'[৩]

কারণ তাঁর মধ্যে ছিল নবীদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও প্রসারের ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রাযি.)-এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি আরবি কবিতা পঠন-পাঠন ও সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। আরবি ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ; তাঁর সামনে ভাষার ব্যাপারে কেউ ভুল করলে শাসিয়ে দিতেন। বিশুদ্ধভাবে আরবি ভাষা শিক্ষা করাকে তিনি দীনের অঙ্গ বলে বিশ্বাস করতেন।

হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহ.) *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে হযরত ওমর (রাযি.) ছিলেন অত্যন্ত কঠোর, একই হাদীস বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে বর্ণনার প্রতি তিনি তাকিদ দেন।[৪]

---

[১] ইবনে শাহীন, ***শারহু মাযাহিবি আহলিস সুন্নাহ***, পৃ. ৩১৪, হাদীস: ১৯৫

[২] ইবনে সা'দ, ***আত-তাবাকাতুল কুবরা***, খ. ৩, পৃ. ২৫০, হাদীস: ৩৭৮৯

[৩] আত-তিরমিযী, ***আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান***, খ. ৫, পৃ. ৬১৯, হাদীস: ৩৬৮৬, হযরত উকবা ইবনে আমির (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[৪] আয-যাহাবী, ***তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায = তাবকাতুল হুফ্‌ফায***, খ. ১, পৃ. ১১, ক্র. ২-২/১

শাহাদত

প্রখ্যাত সাহাবী মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযি.)-এর অগ্নিউপাসক দাস আবু লু'লু ফিরোজ ফজরের নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় এ মহান খলীফাকে ছুরিকাঘাত করে। আহত হওয়ার তৃতীয় দিনে হিজরী ২৩ সনের ২৭ জিলহজ বুধবার তিনি ইনতিকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে হযরত আলী, হযরত উসমান ইবনে আউফ (রাযি.), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.), হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.), হযরত যুবাইর ইবনুল আউওয়াম (রাযি.) ও হযরত তালহা (রাযি.) এ ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীর ওপর তাদের মধ্য থেকে কোনো একজনকে খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করে যান।

হযরত সুহায়িব (রাযি.) জানাযার নামায পড়ান। রওযায়ে নববী (সা.)-এর মধ্যে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.)-এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। তাঁর খিলাফতকাল দশ বছর ছয় মাস চার দিন। তাঁর ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট, তিনিও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট।

হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাযি.)

নাম-নসব ও বংশ

নাম: উসমান, কুনিয়াত: আবু আমর, আবু আবদুল্লাহ, আবু লায়লা এবং লকব: যুন নুরাইন।[১] পিতা: আফফান, মাতা: আরওরা বিনতে কারীয। কুরাইশ বংশের উমাইয়া শাখার সন্তান। তাঁর উর্ধপুরুষ আবদে মান্নাফে গিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নসবের সাথে মিলিত হয়েছে। খুলাফায়ে রাশেদার তৃতীয় খলীফা। তাঁর নানী বায়যা বিনতে আবদুল মুত্তালিব রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ফুফু। জন্ম হস্তীসনের ছ'বছর পরে ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে।[২]

এ হিসেবে রাসুলে করীম (সা.) থেকে তিনি ছয় বছর ছোট। তবে তাঁর জন্মসন সম্পর্কে বিস্তর মতভেদ রয়েছে। ফলে শাহাদতের সময় তাঁর সঠিক বয়স কত ছিল সে সম্পর্কে অনুরূপ মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কোনো কোনো বর্ণনা মতে, তাঁর জন্ম হয় তায়িফে।[৩]

হযরত উসমান (রাযি.) ছিলেন মধ্যমাকৃতির সুঠাম দেহের অধিকারী। মাংসহীন গণ্ডদেশ, ঘন দাড়ি, উজ্জ্বল ফর্সা, ঘন কেশ, বুক ও কোমর চওড়া, কান পর্যন্ত ঝোলানো যুলফী, পায়ের নলা মোটা, পশম ভরা লম্বা বাহু, মুখে বসন্তের দাগ, মেহেদী রঙের দাড়ি এবং স্বর্ণখচিত দাঁত ছিল।

ইসলামপূর্ব জীবন

হযরত উসমান (রাযি.)-এর জীবনের প্রাথমিক অবস্থা অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের মতো জাহিলী যুগের অন্ধকারেই রয়ে গেছে। তাঁর ইসলামপূর্ব জীবন এমনভাবে বিলীন হয়েছে যেন ইসলামের সাথেই তাঁর জন্ম। ইসলামপূর্ব জীবনের বিশেষ কোনো তথ্য ঐতিহাসিকরা আমাদের কাছে পৌঁছাতে পারেননি।

---

[১] (ক) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ৫১, ক্রমিক: ৩৬; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, খ. ৭, পৃ. ১৩৯, ক্রমিক: ২৮৯

[২] ইবনে আবদুল বার্‌র, *আল-ইসতিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব*, খ. ৩, পৃ. ১০৩৮, ক্রমিক: ১৭৭৮

[৩] ড. তাহা হুসাইন, *আল-ফিতনাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ৪৫

হযরত উসমান ছিলেন কুরাইশ বংশের অন্যতম কুষ্টিবিদ্যাবিশারদ। কুরাইশদের প্রাচীন ইতিহাসেও ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। তাঁর প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, সৌজন্য ও লৌকিকতাবোধ ইত্যাদি গুণাবলির জন্য সবসময় তাঁর পাশে মানুষের ভীড় জমে থাকতো। জাহিলী যুগের কোনো অপকর্ম তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। লজ্জা ও প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তাঁর মহান চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

যৌবনে তিনি অন্যান্য অভিজাত কুরাইশদের মতো ব্যবসা শুরু করেন। সীমাহীন সততা ও বিশ্বস্ততার গুণে ব্যবসায়ে অসাধারণ সাফল্য লাভ করেন। মক্কার সমাজে একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী হিসেবে গনী উপাধি লাভ করেন।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত উসমান (রাযি.)-কে আস-সাবিকুনাল আউওয়ালুন (প্রথমপর্বে ইসলাম গ্রহণকারী), আশারায়ে মুবাশশারা (জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী) এবং সেই ছ'জন শ্রেষ্ঠ সাহাবীর মধ্যে গণ্য করা হয় যাঁদের প্রতি রাসুলে করীম (সা.) আমরণ খুশি ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। তাঁরই তাবলীগ ও উৎসাহে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

মক্কার আরও অনেক নেতৃবৃন্দের আচরণের বিপরীত হযরত উসমান (রাযি.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নুবুওয়াতের সূচনা পর্বেই তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেন এবং আজীবন জান-মাল ও সহায় সম্পত্তি দ্বারা মুসলমানদের কল্যাণব্রতী ছিলেন। হযরত উসমান (রাযি.) বলেন,

إِنِّيْ لَرَابِعُ أَرْبَعَةٍ فِي الْإِسْلَامِ.

'আমি ইসলাম গ্রহণকারী চারজনের মধ্যে চতুর্থ।'[২]

ইবনে ইসহাক (রহ.)-এর মতে, হযরত আবু বকর (রাযি.), হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত যায়েদ ইবনুল হারিস (রাযি.)-এর পরে ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি হযরত উসমান (রাযি.)।

---

[১] ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়া*, খ. ১, পৃ. ২৫০

[২] ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, খ. ৩, পৃ. ৫৭৮, ক্রমিক: ৩৫৮৯

হযরত উসমান (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সীরাত লেখক ও মুহাদ্দীসগণ যেসব বর্ণনা দিয়েছেন তার সারকথা নিম্নরূপ:

কেউ কেউ বলেন, তাঁর খালা সু'দা ছিলেন সে যুগের একজন বিশিষ্ট 'কাহিন' বা ভবিষ্যদ্বক্তা। তিনি নবী করীম (সা.) সম্পর্কে হযরত উসমান (রাযি.)-কে কিছু কথা বলেন এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনার জন্য উৎসাহ দেন। তারই উৎসাহে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

পক্ষান্তরে ইবনে সা'দ (রহ.)সহ আরও অনেকে বর্ণনা করেন, হযরত উসমান (রাযি.) সিরিয়া সফরে ছিলেন। যখন তিনি মু'আন ও যারকা-এর মধ্যবর্তী স্থানে বিশ্রাম করছিলেন তখন তন্দ্রালু অবস্থায় এক আহবানকারীকে বলতে শুনলেন! ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তিরা, তাড়াতাড়ি কর। আহমদ নামের রাসুল মক্কায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। মক্কায় ফিরে এসে শুনতে পেলেন ব্যাপারটি সত্য। অতঃপর হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর আহ্বানে ইসলাম গ্রহণ করেন।[২]

হযরত উসমান (রাযি.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁর বয়স তিরিশের ওপর। ইসলামপূর্ব যুগেও হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। প্রায় প্রতিদিনই তাঁর হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর বাড়িতে যাতায়াত ছিল। একদিন হযরত আবু বকর (রাযি.) তাঁর সামনে ইসলাম পেশ করলেন।

ঘটনাক্রমে রাসুলুল্লাহ (সা.)ও তখন সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, *'উসমান! জান্নাতের প্রবেশকে মেনে নাও। আমি তোমাদের এবং আল্লাহর সকল মাখলুকের প্রতি তাঁর রাসুল হিসেবে এসেছি।'* একথা শোনার সাথে সাথে তিনি ইসলাম কবুল করেন। হযরত উসমান (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর খালা সু'দা তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি কাসীদা (কবিতা) রচনা করেছিলেন।

হযরত উসমান (রাযি.)-এর সহোদরা হযরত আমীনা (রাযি.), বৈপিত্রীয় ভাই বোন হযরত ওয়ালীদ (রাযি.), হযরত খালিদ (রাযি.), হযরত আম্মারা (রাযি.), হযরত উম্মু কুলসুম (রাযি.) সবাই মুসলমান হয়েছিলেন। তাঁদের পিতা উকবা ইবনে আবু মুয়ীত। ইমাম আবুল হাসান আদ-দারাকুতনী (রহ.)

[১] ড. তাহা হুসাইন, *আল-ফিতনাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ৪৬

[২] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ৫২, হাদীস: ২৯২২

বর্ণনা করেছেন, হযরত উম্মু কুলসুম (রাযি.) প্রথমপর্বের একজন মুহাজির। বলা হয়েছে, তিনিই প্রথম কুরাইশ বধূ যিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। হযরত উসমান (রাযি.)-এর অন্য ভাই-বোন মক্কাবিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের পর কুরাইশদের একজন সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ইসলামের শত্রুদের লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়। তাঁর চাচা হাকাম ইবনে আবুল আস তাঁকে রশি দিয়ে বেঁধে বেদম মার দিত। সে বলতো, একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করে তুমি আমাদের বাপ-দাদার মুখে কালি দিয়েছ। এ ধর্ম ত্যাগ না করা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়া হবে না। এতে হযরত উসমান (রাযি.)-এর ঈমান একটুও টলেনি। তিনি বলতেন, তোমাদের যা ইচ্ছে কর, এ দীন আমি কখনো ছাড়তে পারবো না।[১]

বিয়ে

হযরত উসমান (রাযি.) ইসলাম গ্রহণের পর রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজ কন্যা হযরত রুকাইয়া (রাযি.)-কে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। হিজরী দ্বিতীয় সনে মদীনায় হযরত রুকাইয়া (রাযি.)-এর ইনতিকাল হলে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর দ্বিতীয় কন্যা হযরত উম্মু কুলসুম (রাযি.)-কে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। এ কারণে তিনি যুন নুরাইন (দু'জ্যোতি)-এর অধিকারী উপাধি লাভ করেন।

হযরত রুকাইয়া (রাযি.) ছিলেন হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর গর্ভজাত সন্তান। তাঁর প্রথম শাদি হয় উতবা ইবনে আবু লাহাবের সাথে এবং হযরত উম্মু কুলসুম (রাযি.)-এর শাদি হয় আবু লাহাবের দ্বিতীয় পুত্র উতবার সাথে। আবু লাহাব ছিল আল্লাহর নবীর কট্টর দুশমন। পবিত্র কুরআনের সুরা লাহাব নাযিলের পর আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মু জামীল (হাম্মা লাতাল হাতাব) তাদের পুত্রদ্বয়কে নির্দেশ দিল হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কন্যাদ্বয়কে তালাক দেওয়ার জন্য। তারা তালাক দিল।

অবশ্য হাফিয জালালউদ্দীন আস-সুয়ুতী (রহ.) মনে করেন, ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই হযরত রুকাইয়া (রাযি.)-এর সাথে হযরত উসমান (রাযি.)-এর শাদি হয়। উপর্যুক্ত ঘটনার আলোকে হাফিয আস-সুয়ুতী (রহ.)-এর মতটি গ্রহণযোগ্য মনে হয় না।

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ৫২, হাদীস: ২৯২৩

হিজরত

নুবুওয়াতের পঞ্চম বছরে মক্কার মুশরিকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে প্রথম যে দলটি হাবশায় হিজরত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হযরত উসমান (রাযি.) ও তাঁর স্ত্রী হযরত রুকাইয়া (রাযি.)ও ছিলেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) বলেন,

خَرَجَ عُثْمَانُ ﵁ مُهَاجِرًا إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبَشَةِ وَمَعَهُ رُقَيَّةُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

'হাবশার মাটিতে প্রথম হিজরতকারী হযরত উসমান (রাযি.) ও তাঁর স্ত্রী নবীদুহিতা হযরত রুকাইয়া (রাযি.)।'[১]

রাসুল (সা.) দীর্ঘদিন তাঁদের কোনো খোঁজ-খবর না পেয়ে ভীষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। সেই সময় এক কুরাইশ মহিলা হাবশা থেকে মক্কায় এলো। তার কাছে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁদের দু'জনের কুশল জিজ্ঞেস করেন। সে সংবাদ দেয়, আমি দেখেছি, হযরত রুকাইয়া (রাযি.) গাধার ওপর সওয়ার হয়ে আছে এবং হযরত উসমান (রাযি.) গাধাটি তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁদের জন্য দুআ করেন,

«صَحِبَهُمَا اللهُ تَعَالَىٰ، إِنَّ عُثْمَانَ لَأَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ بِأَهْلِهِ بَعْدَ لُوْطٍ ﵇».

'আল্লাহ তাঁদের সহায় হোন। হযরত লুত (আ.)-এর পর উসমান আল্লাহর রাস্তায় পরিবার-পরিজনসহ প্রথম হিজরতকারী।'[২]

হাবশা অবস্থানকালে তাঁদের সন্তান আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করে এবং এ ছেলের নাম অনুসারে তাঁর কুনিয়াত হয় আবু আবদুল্লাহ। হিজরী ৪র্থ সনে আবদুল্লাহ মারা যান। হযরত রুকাইয়া (রাযি.)-এর সাথে তাঁর দাম্পত্য জীবন খুব সুখের হয়েছিল। লোকেরা বলাবলি করতো, কেউ যদি সর্বোত্তম জুটি দেখতে চায় সে যেন হযরত উসমান (রাযি.) ও হযরত রুকাইয়া (রাযি.)-কে দেখে।

হযরত উসমান (রাযি.) বেশ কিছুদিন হাবশায় অবস্থান করেন। অতঃপর মক্কায় ফিরে আসেন এ গুজব শুনে যে, মক্কার নেতৃবৃন্দ ইসলাম গ্রহণ করেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মদীনায় হিজরতের পর আবার তিনি

[১] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১, পৃ. ৯০, হাদীস: ১৪৩

[২] (ক) ইবনে আবু আসিম, *আল-আহাদ ওয়াল মাসানী*, খ. ১, পৃ. ১২৩, হাদীস: ১২৩; (খ) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ৮, পৃ. ১২৯, ক্রমিক: ১১১৮৮

মদীনায় হিজরত করেন। এভাবে তিনি যুল হিজরতাইন (দু'হিজরত)-এর অধিকারী হন।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ

একমাত্র বদর ছাড়া সকল যুদ্ধে তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন বদর যুদ্ধে রওয়ানা হন, হযরত রুকাইয়া (রাযি.) তখন রোগশয্যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে হযরত উসমান (রাযি.) পীড়িত স্ত্রীর সেবার জন্য মদীনায় থেকে যান। বদরের বিজয়ের খবর যেদিন মদীনায় এসে পৌঁছুলো সেদিনই হযরত রুকাইয়া (রাযি.) ইনতিকাল করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত উসমান (রাযি.)-এর জন্য বদরের যোদ্ধাদের মতো সওয়াব ও গনীমতের অংশ ঘোষণা করেন।[১] এ হিসেবে পরোক্ষভাবে তিনিও বদরী সাহাবী।

হযরত রুকাইয়া (রাযি.)-এর ইনতিকালের পর রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত রুকাইয়া (রাযি.)-এর ছোট বোন হযরত উম্মু কুলসুম (রাযি.)-কে হযরত উসমান (রাযি.)-এর সাথে বিয়ে দেন হিজরী তৃতীয় সনে। একটি বর্ণনায় জানা যায়, আল্লাহর নির্দেশেই রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত উম্মু কুলসুম (রাযি.)-কে হযরত উসমান (রাযি.)-এর সাথে বিয়ে দেন। হিজরী নবম সনে হযরত উম্মু কুলসুম (রাযি.)ও নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান। হযরত উম্মু কুলসুম (রাযি.)-এর মৃত্যুর পর রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

«لَوْ أَنَّ لَنَا ثَالِثَةً لَزَوَّجِنَا عُثْمَانَ بِهَا».

'আমার যদি তৃতীয় কোনো মেয়ে থাকতো তাকেও আমি উসমান (রাযি.)-এর সাথে বিয়ে দিতাম।'[২]

হযরত উসমান (রাযি.) উহুদের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় কিছু যোদ্ধাদের মতো রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে অটল থাকতে পারেননি। অধিকাংশ মুজাহিদদের সাথে তিনিও ময়দান ছেড়ে চলে যান। অবশ্য আল্লাহ তাআলা তাঁদের জন্য ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। পরবর্তী সকল যুদ্ধেই অন্যসব বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের মতো অংশগ্রহণ করেছেন।

রাসুলুল্লাহ (সা.) তাবুক অভিযানের প্রস্তুতির ঘোষণা দিলেন। মক্কা ও অন্যান্য আরব গোত্রসমূহেও ঘোষণা দিলেন এ অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য।

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ৫৩, হাদীস: ২৯২৭

[২] (ক) ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, খ. ৭, পৃ. ৩৭৪, ক্রমিক: ৭৫৮১; (খ) মুহাম্মদ রিযা, *যিন নুরাইন উসমান ইবনু আফফান আল-খলীফাতুস সালিস*, পৃ. ১৩

ইসলামি ফৌজের সংগঠন ও ব্যয় নির্বাহের সাহায্যের আবেদন জানালেন। সাহাবায়ে কেরাম ব্যাপকভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন। হযরত আবু বকর (রাযি.) তাঁর সকল অর্থ রাসুলের হাতে তুলে দিলেন। হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর মোট অর্থের অর্ধেক নিয়ে হাজির হলেন। আর এ যুদ্ধের এক তৃতীয়াংশ সৈন্যের যাবতীয় ব্যয়ভার হযরত উসমান (রাযি.) নিজ কাঁধে তুলে নিলেন। তিনি সাড়ে নয়শ' উট ও পঞ্চাশটি ঘোড়া সরবরাহ করেন।

ইবনে ইসহাক (রহ.) বলেন, তাবুকের বাহিনীর পেছনে হযরত উসমান (রাযি.) এত বিপুল অর্থ ব্যয় করেন যে, তাঁর সমপরিমাণ আর কেউ ব্যয় করতে পারেনি। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, তাবুকে রণপ্রস্তুতির জন্য হযরত উসমান (রাযি.) এক হাজার দীনার নিয়ে এসে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কোলে ঢেলে দেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) খুশিতে দীনারগুলো উল্টে-পাল্টে দেখেন এবং বলেন,

«مَا ضَرَّ عُثْمَانُ مَا عَمِلَ بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ».

'আজ থেকে উসমান যা কিছুই করবে কোনো কিছুই তাঁর জন্য ক্ষতিকর হবে না।'[১]

এভাবে অধিকাংশ যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় তিনি প্রাণ খুলে চাঁদা দিতেন। একটি বর্ণনায় এসেছে, তাবুকের যুদ্ধে তাঁর দানে সন্তুষ্ট হয়ে রাসুল (সা.) তাঁর আগে-পিছের সকল গুনাহ মাফের জন্য দুআ করেন এবং তাঁকে জান্নাতের ওয়াদা করেন।[২]

হুদাইবিয়ার ঘটনা। রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত ওমর (রাযি.)-কে ডেকে বললেন, 'তুমি মক্কায় যাও। মক্কার নেতৃবৃন্দকে আমাদের আগমণের উদ্দেশ্য অবহিত কর।' হযরত ওমর (রাযি.) বিনীতভাবে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! কুরাইশদের কাছ থেকে আমার জীবনের আশঙ্কা করছি। আপনি জানেন তাদের সাথে আমার দুশমনি কতখানি। আমি মনে করি উসমানই এ কাজের উপযুক্ত। রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত উসমান (রাযি.)-কে ডাকলেন। আবু সুফিয়ান ও অন্যান্য কুরাইশ নেতৃবৃন্দের নিকট এ পয়গামসহ হযরত উসমান (রাযি.)-কে পাঠালেন যে, 'আমরা যুদ্ধ নয়, বরং বায়তুল্লাহর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছি।'

[১] আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ৩, পৃ. ১১০, হাদীস: ৪৫৫৩, হযরত আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[২] ড. তাহা হুসাইন, *আল-ফিতনাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ৪৭

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পয়গাম নিয়ে হযরত উসমান (রাযি.) মক্কায় পৌঁছলেন। সর্বপ্রথম আবান ইবনে সাঈদ ইবনুল আসের সাথে তাঁর দেখা হয়। আবান তাঁকে নিরাপত্তা দেন। আবানকে সঙ্গে করে তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের সাথে দেখা করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পয়গাম পৌঁছে দেন। তারা হযরত উসমান (রাযি.)-কে বলেন, তুমি ইচ্ছে করলে তাওয়াফ করতে পার। কিন্তু হযরত উসমান (রাযি.) তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আল্লাহর রাসুল (সা.) যতক্ষণ তাওয়াফ না করেন আমি তাওয়াফ করতে পারি না। কুরাইশরা তাঁর একথায় ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে আটক করে।

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, হযরত উসমান (রাযি.)-কে তারা তিনদিন আটক করে রাখে। এ দিকে হুদাইবিয়ায় মুসলিম শিবিরে গুজব ছড়িয়ে পড়ে হযরত উসমান (রাযি.)-কে শহীদ করা হয়েছে। রাসুল (সা.) ঘোষণা করলেন, 'উসমানের রক্তের বদলা না নিয়ে আমরা প্রত্যাবর্তন করবো না।' রাসুল (সা.) নিজের ডান হাতটি বাম হাতের ওপরে রেখে বলেন, 'হে আল্লাহ! এ বায়আত উসমানের পক্ষ থেকে। সে তোমার ও তোমার রাসুলের কাজে মক্কায় গেছে।' হযরত উসমান (রাযি.) মক্কা থেকে ফিরে এসে বায়আতের কথা জানতে পারেন। তিনি নিজেও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে বায়আত করেন। ইতিহাসে এ ঘটনা বায়আতু রিদওয়ান, বায়আতুশ শাজারা ইত্যাদি নামে খ্যাত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এ বায়আতের প্রশংসা করা হয়েছে।[১]

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর যখন হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর হাতে বায়আত নেওয়া হচ্ছিল উসমান সংবাদ পেয়ে খুব দ্রুত সেখানে যান এবং হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর হাতে বায়আত করেন। মৃত্যুকালে হযরত আবু বকর (রাযি.) হযরত ওমর (রাযি.)-কে খলীফা মনোনীত করে যে অঙ্গীকারপত্রটি লিখে যান তার লেখক ছিলেন হযরত উসমান (রাযি.)। খলীফা হযরত ওমর (রাযি.)-এর হাতে তিনিই সর্বপ্রথম বায়আত করেন।

খলীফা নির্বাচিত

হযরত ওমর (রাযি.) ছুরিকাহত হয়ে যখন মৃত্যুশয্যায় তাঁর কাছে দাবি করা হলো পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য। কিন্তু তিনি ইতস্তত করে বললেন, 'আমি যদি খলীফা বানিয়ে যাই, তবে তার দৃষ্টান্ত অবশ্য আছে, যেমনটি করেছেন আমার থেকেও এক উত্তম ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আবু বকর

[১] ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়া*, খ. ২, পৃ. ৩১৫

(রাযি.) আর যদি না-ও বানিয়ে যাই তারও দৃষ্টান্ত আছে। যেমনটি করেছিলেন আমার থেকেও এক উত্তম ব্যক্তি অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ (সা.)।'

তিনি আরও বললেন, 'হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) জীবিত থাকলে তাঁকেই খলীফা বানিয়ে যেতাম। আমার রব আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আপনার নবীকে আমি বলতে শুনেছি, তিনি এ উম্মতের আমীন বা পরম বিশ্বাসী ব্যক্তি। যদি হযরত আবু হুযাইফা (রাযি.)-এর আযাদকৃত দাস হযরত সালিম (রাযি.)ও আজ জীবিত থাকতো তাকেও খলীফা বানিয়ে যেতে পারতাম। আমার রব জিজ্ঞেস করলে বলতাম, আপনার নবীকে আমি বলতে শুনেছি, সালেম বড় আল্লাহ-প্রেমিক।'

এক ব্যক্তি তখন বললো, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) তো আছেন। তিনি বলে উঠলেন, 'আল্লাহ তোমার অমঙ্গল করুন। কসম আল্লাহর! আমি আল্লাহর কাছে এমনটি চাই না। .... খিলাফতের এ দায়িত্বের মধ্যে যদি ভালো কিছু থাকে আমার বংশের থেকে আমি তা লাভ করেছি। আর যদি তা মন্দ হয় তাও আমরা পেয়েছি। ওমরের বংশের এক ব্যক্তির হিসাব-নিকাশই এজন্য যথেষ্ট। আমি আমার নিজের নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি, আমার পরিবারবর্গকে মাহরুম করেছি। কোনো পুরস্কারও নয় এবং কোনো তিরস্কারও নয় এমনভাবে যদি আমি কোনো মতে রেহাই পাই, নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবো।'

যখন একই কথা তাঁর কাছে আবার বলা হলো, তিনি হযরত আলী (রাযি.)-এর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'তোমাদেরকে হকের ওপর পরিচালনার তিনিই যোগ্য। তবে আমি জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় এ দায়িত্ব বহন করতে রাযি নই। তোমাদের সামনে এ একটি দল আছেন, যাঁদের সম্পর্কে রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তাঁরা জান্নাতের অধিবাসী।' তাঁরা হলেন আবদে মান্নাফের দু'পুত্র হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত উসমান (রাযি.), রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দু'মাতুল হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) ও হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.), রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাওয়ারী ও ফুফাতো ভাই হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.) ও হযরত তালহা (রাযি.)। তাঁদের যেকোনো একজনকে খলীফা নির্বাচিত করবে। তাঁদের যে কেউ খলীফা নির্বাচিত হলে তোমরা তাঁকে সাহায্য করবে, তাঁর সাথে সুন্দর আচরণ করবে। তিনি যদি তোমাদের কারো ওপর কোনো দায়িত্ব অর্পণ করেন, যথাযথভাবে তোমরা তা পালন করবে।'

হযরত ওমর (রাযি.) উল্লিখিত দলটির সদস্যদের ডেকে বললেন, 'আপনাদের ব্যাপারে আমি ভেবে দেখছি। আপনারা জনগণের নেতা ও পরিচালক। খিলাফতের দায়িত্বটি আপনাদের মধ্যেই থাকা উচিৎ। আপনাদের প্রতি সন্তুষ্ট অবস্থায় রাসুলুল্লাহ (সা.) ইনতিকাল করেছেন। আপনারা ঠিক থাকলে জনগণের ব্যাপারে আমার কোনো ভয় নেই। তবে আপনাদের পারস্পরিক বিবাদকে আমি ভয় করি। জনগণ তাতে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়বে।'

তারপর তিনি নির্বাচনের সময় নির্ধারণ করেছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর তিন দিন তিন রাত। হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাযি.)-কে বললেন, 'আমাকে কবরে শায়িত করার পর এ দলটিকে একত্র করবে এবং তাঁরা তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করবে।' হযরত সুহায়িব (রাযি.)-কে বললেন, 'তিনদিন তুমি নামাযের জামায়াতের ইমামতি করবে। হযরত আলী (রাযি.), হযরত উসমান (রাযি.), হযরত সা'দ (রাযি.), হযরত আবদুর রহমান (রাযি.), হযরত যুবাইর (রাযি.) ও হযরত তালহা (রাযি.)-এর কাছে যাবে, যদি তালহা মদীনায় থাকে (হযরত তালহা তখন মদীনার বাইরে ছিলেন)। তাঁদেরকে এক স্থানে সমবেত করবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকেও হাজির করবে। তবে খিলাফতের কোনো হক তাঁর নেই। তাঁদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। তাঁদের পাঁচজন যদি কোনো একজনের ব্যাপারে একমত হয় এবং একজন দ্বিমত পোষণ করে তরবারি দিয়ে তার কল্লা কেটে ফেলবে। আর যদি চারজন একমত হয় এবং দু'জন অস্বীকার করে, তবে সে দু'জনের কল্লা উড়িয়ে দেবে। আর যদি তিনজন করে দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর যে পক্ষ সমর্থন করবে তাঁরা তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে নির্বাচন করবে। অন্যপক্ষ যদি আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের সিদ্ধান্ত না মানেন তাহলে আবদুর রহমান ইবনে আউফ যে দিকে থাকবে তোমরা সে দিকে যাবে। বিরোধীরা যদি জনগণের সিদ্ধান্ত না মানে তাহলে তাদেরকে মানাতে বাধ্য করবে।'

হযরত ওমর (রাযি.)-কে দাফন করার পর হযরত মিকদাদ ইনবুল আসওয়াদ (রাযি.) শুরার সদস্যদের হযরত মুসাওয়ার ইবনুল মাখরামা (রাযি.) মতান্তরে হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর হুজরায় একত্র করলেন। তাঁরা পাঁচজন। হযরত তালহা (রাযি.) তখনো মদীনার বাইরে। তাঁদের সাথে যুক্ত হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)। বাড়ির দরজায় প্রহরী নিয়োগ করা হলো হযরত আবু তালহা (রাযি.)-কে। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও

তুমুল বাক-বিতণ্ডা হলো। একপর্যায়ে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে তার দাবি ত্যাগ করতে পার এবং তোমাদের উত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচনের দায়িত্ব আমার ওপর অর্পণ করতে পার? আমি আমার খিলাফতের দাবি ত্যাগ করছি।' হযরত উসমান (রাযি.) সর্বপ্রথম এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.)-এর হাতে তাঁর ক্ষমতা ন্যস্ত করলেন। তারপর অন্য সকলে তাঁর অনুসরণ করলেন। এভাবে খলীফা নির্বাচনের গোটা দায়িত্বটি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.)-এর ওপর এসে বর্তায়।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) দিনরাত রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অন্যসব সাহাবী, মদীনায় অবস্থানরত সকল সেনা-অফিসার, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গসহ সকল স্তরের জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করলেন। কখনো ব্যক্তিগতভাবে, কখনো সম্মিলিতভাবে। প্রায় সকলেই হযরত উসমান (রাযি.)-এর পক্ষে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করলেন।

যেদিন সকালে হযরত ওমর (রাযি.)-এর নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হবে, সে রাতে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) এলেন হযরত মুসাওয়ার ইবনুল মাখরামা (রাযি.)-এর বাড়িতে। তিনি প্রথমে হযরত যুবাইর ইবনুল আউওয়াম (রাযি.) ও হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.)-কে ডেকে মসজিদে নববীর সুফ্ফায় বসে এক এক করে তাঁদের সাথে কথা বললেন, এভাবে হযরত উসমান (রাযি.) ও হযরত আলী (রাযি.)-র সাথেও সুবহে সাদিক পর্যন্ত একান্তে আলাপ করেন।

এদিকে মসজিদে নববী লোকে পরিপূর্ণ। শেষ সিদ্ধান্তটি শোনার জন্য সবাই ব্যাকুল। ফজরের নামাযের পর সমবেত মদীনাবাসীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত এক ভাষণের পর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) খলীফা হিসেবে হযরত উসমান (রাযি.)-এর নামটি ঘোষণা করেন এবং তাঁর হাতে বায়আত করেন। তারপরই হযরত আলী (রাযি.)ও বায়আত করেন। অতঃপর সমবেত জনমণ্ডলী হযরত উসমান (রাযি.)-এর হাতে বায়আত করেন। হিজরী ২৪ সনের ১লা মুহাররম সোমবার সকালে তিনি খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।[১]

[১] (ক) ইবনে জরীর আত-তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক = তারীখুত তাবারী*, খ. ৪, পৃ. ২২৭–২৩২; (খ) ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, খ. ২, পৃ. ৪৪০–৪৪৪; (গ) মুহাম্মদ আল-খিযরী বেগ, *মুহাযারাতু তারিখিল উম্মাহ আল-ইসলামিয়া*, পৃ. ৩৩১–৩৩৪

দুস্কৃত শক্তির বিদ্রোহ ও শাহাদত

হযরত উসমান (রাযি.) অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খিলাফতের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। খিলাফতের প্রথম পর্যায়ে তাঁর বিরুদ্ধে তেমন অভিযোগ শোনা যায় না। তবে শেষের দিকে বাসরা, কুফা, মিসর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। মূলত এ অসন্তোষ সৃষ্টির পশ্চাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে পরাজিত ইহুদি শক্তি। ধীরে ধীরে তারা সংঘবদ্ধভাবে বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং মদীনার খলীফার বাসভবন ঘেরাও করে।

এ বিদ্রোহীদের মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিল না। তারা খলীফাকে হত্যার হুমকি দিয়ে পদত্যাগ দাবি করে। খলীফার বাসগৃহের খাদ্য ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। মসজিদে নামায আদায়ে বাধা সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে তারা খলীফার বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং রোযা অবস্থায় কুরআন তিলাওয়াতরত বয়োবৃদ্ধ খলীফাকে শহীদ করে। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) এ ঘটনা সংঘটিত হয় হিজরী ৩৫ সনের ১৮ জিলহজ, শুক্রবার আসর নামাযের পর। রাসুল (সা.)-এর ওফাত ও হযরত উসমান (রাযি.)-এর শাহাদতের মধ্যে ২৫ বছরের ব্যবধান। বারো দিন কম বারো বছর তিনি খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেন।

জান্নাতুল বাকীর হাশশে কাওকাব নামক অংশে তাঁকে দাফন করা হয়। মাগরিব ও ইশার মাঝামাঝি সময়ে তাঁর দাফন কার্য সমাধা হয়। হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রাযি.) তাঁর জানাযার ইমামতি করেন। কাবুল থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিশাল খিলাফতের কর্ণধারের জানাযায় মাত্র সত্তরজন লোক অংশগ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স কত হয়েছিল সে সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে ৮২ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ছিল।[১]

খলীফা উসমান বিদ্রোহীদের দ্বারা ঘেরাও হওয়ার পর ইচ্ছা করলে তাদের নির্মূল করতে পারতেন। অন্য সাহাবায়ে কেরাম সেজন্য প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু হযরত উসমান (রাযি.) নিজের জন্য কোনো মুসলমানের রক্ত ঝরাতে চাননি। তিনি চাননি মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাতের সূচনাকারী হতে। প্রকৃতপক্ষে এমন এক নাজুক মুহূর্তে হযরত উসমান (রাযি.) যে কর্ম-পদ্ধতি অবলম্বন করেন তা একজন খলীফা ও একজন বাদশার মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্ট করে তোলে। তাঁর স্থলে যদি কোনো বাদশাহ হতো, নিজের ক্ষমতা

[১] ড. তাহা হুসাইন, *আল-ফিতনাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ৪৫

টিকিয়ে রাখতে যেকোনো কৌশল প্রয়োগ করতে দ্বিধাবোধ করতো না। তাতে যত ক্ষতি বা ধ্বংসই হোক না কেন। কিন্তু তিনি ছিলেন খলীফা রাশেদ। নিজের জীবন দেওয়াকে তুচ্ছ মনে করেছেন। তবুও যেন এমন সম্মান বিনষ্ট না হতে পারে যা একজন মুসলমানের সবকিছু থেকে প্রিয় হওয়া উচিৎ।

হযরত উসমান (রাযি.)-এর অবদান

ইসলামের জন্য হযরত উসমান (রাযি.)-এর অবদান মুসলিম জাতি কোনো দিন ভুলতে পারবে না। ইসলামের সেই সংকটকালে আল্লাহর রাস্তায় তিনি যেভাবে খরচ করেছেন, অন্য কোনো ধনাঢ্য মুসলমানের মধ্যে তার কোনো নজীর নেই। তিনি বিস্তর অর্থের বিনিময়ে ইহুদি মালিকানাধীন বীরে রুমা কূপটি খরিদ করে মদীনার মুসলমানদের জন্য ওয়াক্‌ফ করেন। বিনিময়ে রাসুল (সা.) তাঁকে জান্নাতের অঙ্গীকার করেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস যিনি একদিন বীরে রুমা ওয়াক্‌ফ করে মদীনাবাসীদের পানি-কষ্ট দূর করেছিলেন, তাঁর বাড়িতেই সেই কূপের পানি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেই ঘেরাও অবস্থায় একদিন তিনি জানালা দিয়ে মাথা বের করে মদীনাবাসীদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে আমিই বীরে রুমা খরিদ করে সর্বসাধারণের জন্য ওয়াক্‌ফ করেছি। আজ সেই কূপের পানি থেকেই তোমরা আমাকে বঞ্চিত করছো। আমি আজ পানির অভাবে ময়লা পানি দিয়ে ইফতার করছি।'

ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা

হযরত উসমান (রাযি.)-এর ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে রাসুল (সা.) হতে যত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার সারকথা হচ্ছে, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকটতম ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর বিশেষ স্থান ছিল। রাসুল (সা.) বার বার তাঁকে জান্নাতের খোশখবর দিয়েছেন। নবী (সা.) বলেছেন,

«لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيْقٌ وَرَفِيْقِيْ - يَعْنِيْ فِي الْـجَنَّةِ - عُثْمَانُ».

'প্রত্যেক নবীরই বন্ধু থাকে, জান্নাতে আমার বন্ধু হবে উসমান।'[১]

[১] আত-তিরমিযী, ***আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান***, খ. ৫, পৃ. ৬২৪, হাদীস: ৩৬৯৮, হযরত তালহা ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) থেকে বর্ণিত

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: «كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ نَعْدِلُ بِأَبِيْ بَكْرٍ أَحَدًا، ثُمَّ عُمَرَ، ثُمَّ عُثْمَانَ، ثُمَّ نَتْرُكُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ، لاَ نُفَاضِلُ بَيْنَهُمْ».

'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, নবী (সা.)-এর সময়ে মুসলমানরা হযরত আবু বকর (রাযি.), হযরত ওমর (রাযি.) ও হযরত উসমান (রাযি.)-কে সকলের থেকে অধিক মর্যাদাবান মনে করতেন। তা ছাড়া অন্য কোনো সাহাবীকে বিশেষ কোনো মর্যাদা দেওয়া হতো না।'[১]

হযরত উসমান (রাযি.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে কাতিবে অহী (অহী লেখক) ছিলেন। সিদ্দীকী ও ফারুকী যুগে ছিলেন পরামর্শদাতা। প্রতিবছরই তিনি হজ আদায় করতেন। তবে যে বছর শহীদ হন, ঘেরাও থাকার কারণে হজ আদায় করতে পারেননি। সারা বছরই রোযা রাখতেন। সারারাত ইবাদতে কাটতো। এক রাকআতে একবার কুরআন শরীফ খতম করতেন। রাতে কারও ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতেন না। রাতে চাকরদের খেদমত গ্রহণ করতেন না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত লাজুক।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

«وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ»

'আমার উম্মতের মধ্যে উসমান সর্বাধিক লজ্জাশীল।'[২]

তিনি আরও বলেছেন,

«أَلَا أَسْتَحِيْ مِمَّنْ يَسْتَحْيِيْ مِنْهُ الْـمَلَائِكَةُ».

'উসমান (রাযি.)-কে দেখে ফেরেশতারাও লজ্জা পায়।'[৩]

আত্মীয়-বন্ধুদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সদয়। তাঁর গুণাবলি ও মর্যাদা সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে প্রকাশ করা যাবে না। আল্লাহ তাঁর ওপর সন্তুষ্ট, তিনিও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট।

[১] আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, ৫, পৃ. ১৪, হাদীস: ৩৬৯৭

[২] আত-তিরমিযী, ***আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান***, খ. ৫, পৃ. ৬৬৪, হাদীস: ৩৬৯০, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[৩] আহমদ ইবনে হাম্বল, ***আল-মুসনদ***, খ. ১, পৃ. ৫৩৮, হাদীস: ৫১৪, হযরত আয়িশা (রাযি.) থেকে বর্ণিত

হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.)

নাম-নসব ও বংশ

নাম: আলী, লকব: আসাদুল্লাহ, হায়দার ও মুরতাযা, কুনিয়াত: আবুল হাসান ও আবু তুরাব। পিতা: আবু তালিব আবদু মান্নাফ, মাতা: ফাতিমা। পিতা-মাতা উভয়ে কুরাইশ বংশের হাশিমী শাখার অন্তর্ভুক্ত। হযরত আলী (রাযি.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আপন চাচাতো ভাই।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নুবুওয়াতপ্রাপ্তির দশ বছর পূর্বে তাঁর জন্ম। আবু তালিব ছিলেন ছাপোষা মানুষ। চাচাকে একটু সাহায্য করার উদ্দেশ্যে রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজ দায়িত্বে নিয়ে নেন হযরত আলী (রাযি.)-কে। এভাবে নবী-পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে তিনি বেড়ে ওঠেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) যখন নুবুওয়াত লাভ করেন হযরত আলী (রাযি.)-এর বয়স তখন নয় থেকে এগারো বছরের মধ্যে।

ইসলাম গ্রহণ

একদিন ঘরের মধ্যে দেখলেন, রাসুলে করীম (সা.) ও উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রাযি.) সাজদাবনত। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি? উত্তর পেলেন, এক আল্লাহর ইবাদত করছি। তোমাকেও এর দাওয়াত দিচ্ছি। হযরত আলী (রাযি.) তাঁর মুরব্বির দাওয়াত বিনা দ্বিধায় কবুল করেন। মুসলমান হয়ে যান। কুফর, শিরক ও জাহিলিয়াতের কোনো অপকর্ম তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে সর্বপ্রথম হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাযি.) নামায আদায় করেন। এ ব্যাপারে কোনো মতপার্থক্য নেই। অবশ্য হযরত আবু বকর (রাযি.), হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রাযি.) এ তিনজনের কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে।[১]

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২০, হাদীস: ২৮১৩

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) ও হযরত সালমান আল-ফারিসী (রাযি.)-এর বর্ণনা মতে, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রাযি.)-এর পর হযরত আলী (রাযি.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে এ সম্পর্কে সবাই একমত যে, মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রাযি.), বয়স্ক আযাদ পরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রাযি.), দাসদের মধ্যে হযরত যায়েদ ইবনে হারিসা (রাযি.) ও কিশোরদের মধ্যে হযরত আলী (রাযি.) প্রথম মুসলমান।[১]

নুবুওয়াতের তৃতীয় বছরে রাসুলে করীম (সা.) হুকুম দিলেন হযরত আলী (রাযি.)-কে, কিছু লোকের আপ্যায়নের ব্যবস্থা কর। আবদুল মুত্তালিব খান্দানের সব মানুষ উপস্থিত হল। আহারপর্ব শেষ হলে রাসুল (সা.) তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন, 'আমি এমন এক জিনিস নিয়ে এসেছি যা দীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্য কল্যাণকর। আপনাদের মধ্যে কে আমার সঙ্গী হবে?' সকলেই নিরব। হঠাৎ হযরত আলী (রাযি.) বলে উঠলেন, 'যদিও আমি অল্পবয়স্ক, চোখের রোগে আক্রান্ত, দুর্বল দেহ, আমি সাহায্য করবো আপনাকে।'[২]

হিজরত

হিজরতের সময় হল। অধিকাংশ মুসলমান মক্কা ছেড়ে মদীনা চলে গেছেন। রাসুলে করীম (সা.) আল্লাহর হুকুমের প্রতীক্ষায় আছেন। এ দিকে মক্কার ইসলাম বিরোধী শক্তি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রাসুলে করীম (সা.)-কে দুনিয়া থেকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার। আল্লাহ তাঁর রাসুল (সা.)-কে এ খবর জানিয়ে দেন। তিনি মদীনায় হিজরতের অনুমতি লাভ করেন। কাফিরদের সন্দেহ না হয়, এজন্য আলীকে রাসুল (সা.) নিজের বিছানায় ঘুমাবার নির্দেশ দেন এবং সিদ্দীকে আকবরকে সঙ্গে করে রাতের অন্ধকারে মদীনা রওয়ানা হন।

হযরত আলী (রাযি.) রাসুলে করীম (সা.)-এর চাদর মুড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে অত্যন্ত আনন্দ সহকারে ঘুমালেন। তিনি জানতেন, এ অবস্থায় তাঁর জীবন চলে যেতে পারে। কিন্তু তাঁর প্রত্যয় ছিল, এভাবে জীবন গেলে তাঁর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কিছু হবে না। সুবহে সাদিকের সময় মক্কার পাষণ্ডরা

[১] শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, *সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম*, খ. ১, পৃ. ২১৭

[২] ইবনে জরীর আত-তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক = তারীখুত তাবারী*, খ. ২, পৃ. ৩২০–৩২১

তাদের অসৎ উদ্দেশ্যে ভেতরে প্রবেশ করে দেখতে পেল, রাসুলে করীম (সা.)-এর স্থানে তাঁরই এক ভক্ত জীবন কুরবানির জন্য প্রস্তুত হয়ে শুয়ে আছে। তারা ব্যর্থ হয় এবং আল্লাহ তাআলা হযরত আলী (রাযি.)-কে হিফাযত করেন।

এ হিজরত প্রসঙ্গে হযরত আলী (রাযি.) বলেন,

لَمَّا خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فِي الْهِجْرَةِ أَمَرَنِيْ أَنْ أُقِيْمَ بَعْدَهُ حَتَّىٰ أُؤَدِّيَ وَدَائِعَ كَانَتْ عِنْدَهُ لِلنَّاسِ، وَلِذَا كَانَ يُسَمَّى الْأَمِيْنَ، فَأَقَمْتُ ثَلَاثًا، فَكُنْتُ أَظْهَرُ مَا تَغَيَّبْتُ يَوْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ خَرَجْتُ فَجَعَلْتُ أَتْبَعُ طَرِيْقَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ حَتَّىٰ قَدِمْتُ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُقِيْمٌ، فَنَزَلْتُ عَلَىٰ كُلْثُوْمِ بْنِ الْهِدْمِ، وَهُنَالِكَ مَنْزِلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ.

'রাসুলুল্লাহ (সা.) মদীনা রওয়ানার পূর্বে আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি মক্কায় থেকে যাব এবং লোকদের যেসব আমানত তাঁর কাছে আছে তা ফেরত দেব। এজন্যই তো তাঁকে আল-আমীন বলা হতো। আমি তিনদিন মক্কায় থাকলাম। তারপর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পথ ধরে মদীনার দিকে বেরিয়ে পড়লাম। অবশেষে বনি আমর ইবনে আওফ যেখানে রাসুল (সা.) অবস্থান করছিলেন, আমি উপস্থিত হলাম। হযরত কুলসুম ইবনুল হিদম (রাযি.)-এর বাড়িতে আমার আশ্রয় হল।'[১]

অন্য একটি বর্ণনায়, 'হযরত আলী (রাযি.) রবীউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি কুবায় উপস্থিত হন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তখনো কুবায় ছিলেন।'[২]

দীনী ভ্রাতৃত্ব

মাদানী জীবনের সূচনায় রাসুল (সা.) যখন মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে মুওয়াখাত বা দীনী-ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক কায়েম করছিলেন, তিনি নিজের একটি হাত হযরত আলী (রাযি.)-এর কাঁধে রেখে বলেছিলেন,

«أَنْتَ أَخِيْ، تَرِثُنِيْ وَأَرِثُكَ».

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২০, হাদীস: ২৮১৪
[২] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২০, হাদীস: ২৮১৫

'আলী তুমি আমার ভাই। তুমি হবে আমার এবং আমি হব তোমার উত্তরাধিকারী।'[১]

পরে রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত সাহল ইবনে হুনাইফ (রাযি.)-এর মধ্যে ভ্রাতৃসম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছিলেন।[২]

নবীকন্যা হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর সাথে বিয়ে

হিজরী দ্বিতীয় সনে হযরত আলী (রাযি.) রাসুলে করীম (সা.)-এর জামাই হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিয়তম কন্যা খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ

ইসলামের জন্য হযরত আলী (রাযি.)-এর অবদান অবিস্মরণীয়। রাসুলে করীম (সা.)-এর যুগের সকল যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন তিনি। এ কারণে হুযুর (সা.) তাঁকে হায়দার উপাধিসহ যুল ফিকার নামক একখানি তরবারি দান করেন।

একমাত্র তাবুক অভিযান ছাড়া সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। বদরে তাঁর সাদা পশমী রুমালের জন্য তিনি ছিলেন চিহ্নিত।

عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ كَانَ صَاحِبُ لِوَاءِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَوْمَ بَدْرٍ وَفِيْ كُلِّ مَشْهَدٍ.

'হযরত কাতাদা (রাযি.) থেকে বর্ণিত, বদরসহ প্রতিটি যুদ্ধে আলী ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর পতাকাবাহী।'[৩]

উহুদে যখন অন্যসব মুজাহিদ পরাজিত হয়ে পলায়নরত ছিলেন, তখন যে কয়জন মুষ্টিমেয় সৈনিক রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে কেন্দ্র করে ব্যূহ রচনা করেছিলেন হযরত আলী (রাযি.) তাঁদের একজন। অবশ্য পরে পলায়নকারীদের প্রতি আল্লাহর ক্ষমা ঘোষিত হয়েছে।

ইবনে ইসহাক (রহ.) থেকে বর্ণিত, খন্দকের দিনে আমর ইবনে আবদে উদ্দ বর্ম পরে বের হল। সে হুংকার ছেড়ে বললো, কে আমার সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২১, হাদীস: ২৮১৭
[২] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২১, হাদীস: ২৮১৮
[৩] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২১, হাদীস: ২৮২০

অবতীর্ণ হবে? হযরত আলী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি প্রস্তুত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'এ হচ্ছে আমর, তুমি বস।' আমর আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিল, আমার সাথে লড়বার মতো কেউ নেই? তোমাদের সেই জান্নাত এখন কোথায়, যাতে তোমাদের নিহতরা প্রবেশ করবে বলে তোমাদের ধারণা? তোমাদের কেউই এখন আমার সাথে লড়তে সাহসী নয়?

হযরত আলী (রাযি.) উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি প্রস্তুত। রাসুল (সা.) বললেন, 'বস।' তৃতীয়বারের মতো আহ্বান জানিয়ে আমর তার স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো। হযরত আলী (রাযি.) আবারো উঠে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি প্রস্তুত। রাসুল (সা.) বললেন, 'সে তো আমর।' হযরত আলী (রাযি.) বললেন, তা হোক। এবার হযরত আলী (রাযি.) অনুমতি পেলেন।

হযরত আলী (রাযি.) তাঁর একটি স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করতে করতে আমরের দিকে এগিয়ে গেলেন। আমর জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? বললেন, আলী। সে বললো, আবদে মান্নাফের ছেলে? হযরত আলী (রাযি.) বললেন, আমি আবু তালিবের ছেলে আলী। সে বললো, ভাতিজা! তোমার রক্ত ঝরানো আমি পছন্দ করি না। হযরত আলী (রাযি.) বললেন, আল্লাহর কসম! আমি কিন্তু তোমার রক্ত ঝরানো অপছন্দ করি না।

একথা শুনে আমর ক্ষেপে গেল। নিচে নেমে এসে তরবারি টেনে বের করে ফেললো। সে তরবারি যেন আগুনের শিখা। সে এগিয়ে হযরত আলী (রাযি.)-এর ঢালে আঘাত করে ফেঁড়ে ফেললো। হযরত আলী (রাযি.) পাল্টা এক আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করে ফেললেন। এ দৃশ্য দেখে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকবীর ধ্বনি দিয়ে উঠেন। তারপর হযরত আলী (রাযি.) নিজের একটি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে ফিরে আসেন।[১]

সপ্তম হিজরীতে খায়বার অভিযান চালানো হয়। সেখানে ইহুদিদের কয়েকটি সুদৃঢ় কিল্লা ছিল। প্রথমে সিদ্দীকে আকবর (রাযি.), পরে ফারুকে আযম (রাযি.)-কে কিল্লাগুলো পদানত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁরা কেউই সফলকাম হতে পারলেন না। নবী (সা.) ঘোষণা করলেন,

[১] (ক) আল-বায়হাকী, *দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরীয়ত*, খ. ৩, পৃ. ৪৩৮–৪৩৯, হাদীস: ১৩২০; (খ) ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়া*, খ. ২, পৃ. ২২৪–২২৫; (গ) ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৪, পৃ. ১২১–১২২

«لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ».

'কাল আমি এমন এক বীরের হাতে ঝাণ্ডা তুলে দেব যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রিয়পাত্র। তাঁরই হাতে কিল্লাসমূহের পতন হবে।'

পরদিন সকালে সাহাবায়ে কেরামের সকলেই আশা করছিলেন এ গৌরবটি অর্জন করার। হঠাৎ হযরত আলী (রাযি.)-এর ডাক পড়লো। তাঁরই হাতে খায়বারের সেই দুর্জয় কিল্লাসমূহের পতন হয়।[১]

তাবুক অভিযানে রওয়ানা হওয়ার সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রাযি.)-কে মদীনায় স্থলাভিষিক্ত করে যান। হযরত আলী (রাযি.) আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি যাচ্ছেন, আর আমাকে নারী ও শিশুদের কাছে ছেড়ে যাচ্ছেন? উত্তরে রাসুল (সা.) বললেন,

«أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُوْنَ مِنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هَارُوْنَ مِنْ مُوْسَىٰ؟ إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ».

'হারুন যেমন ছিলেন মুসার, তেমনি তুমি হচ্ছো আমার প্রতিনিধি। তবে আমার পরে কোনো নবী নেই।'[২]

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দূত হিসেবে

নবম হিজরীতে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে প্রথম হজ অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) ছিলেন আমীরুল হজ। তবে কাফিরদের সাথে সম্পাদিত সকল চুক্তি বাতিল ঘোষণার জন্য রাসুল (সা.) হযরত আলী (রাযি.)-কে বিশেষ দূত হিসেবে পাঠান।

দশম হিজরীতে ইয়ামনে ইসলাম প্রচারের জন্য হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ (রাযি.)-কে পাঠানো হয়। ছ'মাস চেষ্টার পরও তিনি সফলকাম হতে পারলেন না, ফিরে এলেন। রাসুলে করীম (সা.) হযরত আলী (রাযি.)-কে পাঠানোর কথা ঘোষণা করলেন।

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ وَأَنَا حَدِيْثُ السِّنِّ، قَالَ: قُلْتُ: تَبْعَثُنِيْ إِلَىٰ قَوْمٍ يَكُوْنُ بَيْنَهُمْ أَحْدَاثٌ، وَلَا عِلْمَ لِيْ بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: «إِنَّ

[১] (ক) ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়া*, খ. ২, পৃ. ৩৩৪; (খ) ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৪, পৃ. ২১২

[২] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২১, হাদীস: ২৮২২

اللهَ سَيَهْدِيْ لِسَانَكَ، وَيُثَبِّتُ قَلْبَكَ» قَالَ: فَمَا شَكَكْتُ فِيْ قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ بَعْدُ.

'হযরত আলী (রাযি.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, আপনি আমাকে এমন লোকদের কাছে পাঠাচ্ছেন যেখানে নতুন নতুন ঘটনা ঘটবে অথচ বিচার ক্ষেত্রে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই। উত্তরে রাসুল (সা.) বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে সঠিক রায় এবং তোমার অন্তরে শক্তিদান করবেন।' তিনি হযরত আলী (রাযি.)-এর মুখে হাত রাখলেন। হযরত আলী (রাযি.) বলেন, অতঃপর আমি কখনো কোনো বিচারে দ্বিধাগ্রস্ত হইনি।'[১]

যাওয়ার আগে রাসুল (সা.) নিজ হাতে হযরত আলী (রাযি.)-এর মাথায় পাগড়ি পরিয়ে দুআ করেন। হযরত আলী (রাযি.) ইয়ামনে পৌঁছে তাবলীগ শুরু করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে সকল ইয়ামনবাসী ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং হামাদান গোত্রের সকলেই মুসলমান হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রাযি.)-কে দেখার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েন। তিনি দুআ করেন, 'আল্লাহ! আলীকে না দেখে যেন আমার মৃত্যু না হয়।' হযরত আলী বিদায়-হজের সময় ইয়ামন থেকে হাজির হয়ে যান।[২]

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর গোসল কাজে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর তাঁর নিকট-আত্মীয়রাই কাফন-দাফনের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত আলী (রাযি.) গোসল দেওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। মুহাজির ও আনসাররা তখন দরজার বাইরে অপেক্ষা করছিলেন।

হযরত আবু বকর (রাযি.), হযরত ওমর (রাযি.) ও হযরত উসমান (রাযি.)-এর খিলাফত মেনে নিয়ে তাঁদের হাতে বায়আত করেন এবং তাঁদের যুগের সকল গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে শরীক থাকেন। অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতেও হযরত উসমান (রাযি.)-কে পরামর্শ দিয়েছেন। যেভাবে হযরত আবু বকর (রাযি.)-কে সিদ্দীক, হযরত ওমর (রাযি.)-কে ফারুক এবং হযরত উসমান (রাযি.)-কে গনী বলা হয় তেমনিভাবে তাঁকেও আলী মুরতাযা বলা হয়। হযরত আবু বকর (রাযি.) ও হযরত ওমর (রাযি.)-এর যুগে তিনি মন্ত্রী ও

[১] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ৬৮, হাদীস: ৩৬; (খ) ইবনে কসীর, *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ৫, পৃ. ১২৪

[২] শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, *সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম*, খ. ১, পৃ. ২২৮–২২৯

উপদেষ্টার ভূমিকা পালন করেন। হযরত উসমান (রাযি.)ও সবসময় তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন।

খলীফা নির্বাচিত

বিদ্রোহীদের দ্বারা হযরত উসমান (রাযি.) ঘেরাও হলে তাঁর নিরাপত্তার ব্যাপারে হযরত আলী (রাযি.)ই সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করেন। সেই ঘেরাও অবস্থায় হযরত উসমান (রাযি.)-এর বাড়ির নিরাপত্তার জন্য তিনি তাঁর দু'পুত্র হযরত হাসান (রাযি.) ও হযরত হুসাইন (রাযি.)-কে নিয়োগ করেন।[১]

হযরত ওমর (রাযি.) ইনতিকালের পূর্বে ছ'জন বিশিষ্ট সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের অসিয়ত করে যান। হযরত আলী (রাযি.)ও ছিলেন তাঁদের একজন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি হযরত আলী (রাযি.)-এর সম্পর্কে মন্তব্য করেন, লোকেরা যদি আলীকে খলীফা বানায় তবে সে তাদেরকে ঠিক রাস্তায় পরিচালিত করতে পারবে।[২] হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর বায়তুল মাকদাস সফরের সময় আলী (রাযি.)-কে মদীনায় নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান।

হযরত উসমান (রাযি.)-এর শাহাদতের পর বিদ্রোহীরা হযরত তালহা (রাযি.), হযরত যুবাইর ইবনুল আউওয়াম (রাযি.) ও হযরত আলী (রাযি.)-কে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য চাপ দেয়। প্রত্যেকেই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অস্বীকৃতি জানান। বিভিন্ন বর্ণনার মাধ্যমে জানা যায়, হযরত আলী (রাযি.) বারবার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন। অবশেষে মদীনাবাসীরা হযরত আলী (রাযি.)-এর কাছে গিয়ে বলেন, খিলাফতের এ পদ এভাবে শূণ্য থাকতে পারে না। বর্তমানে এ পদের জন্য আপনার চেয়ে অধিক উপযুক্ত ব্যক্তি নেই। আপনিই এর হকদার।

মানুষের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত হন। তবে শর্তারোপ করেন যে, আমার বায়আত গোপনে হতে পারবে না। এজন্য সর্বশ্রেণির মুসলমানের সম্মতি প্রয়োজন। মসজিদে নববীতে সাধারণ সভা হলো। মাত্র ষোল অথবা সতেরোজন সাহাবা ছাড়া সকল মুহাজির ও আনসার হযরত আলী (রাযি.)-এর হাতে বায়আত করেন।

[১] ড. তাহা হুসাইন, *আল-ফিতনাতুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ১৯০

[২] ড. তাহা হুসাইন, *আল-ফিতনাতুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ১০

অত্যন্ত জটিল এক পরিস্থিতির মধ্যে হযরত হযরত আলী (রাযি.)-এর খিলাফতের সূচনা হয়। খলীফা হওয়ার পর তাঁর প্রথম কাজ ছিল হযরত উসমান (রাযি.)-এর হত্যাকারীদের শাস্তি বিধান করা। কিন্তু কাজটি সহজ ছিল না।

১. হত্যাকারীদের কেউ চিনতে পারেনি। হযরত উসমান (রাযি.)-এর স্ত্রী হযরত নায়িলা হত্যাকারীদের দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি তাদের কাউকে চিনতে পারেননি। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর হত্যার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত উসমান (রাযি.)-এর এক ক্ষোভ-উক্তির মুখে তিনি পিছটান দেন। মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরও হত্যাকারীদের চিনতে পারেননি।

২. মদীনা তখন হাজার হাজার বিদ্রোহীদের কব্জায়। তারা হযরত আলী (রাযি.)-এর সেনাবাহিনীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু তাঁর এ অসহায় অবস্থা তৎকালীন অনেক মুসলমানই উপলব্ধি করেননি। তাঁরা হযরত আলী (রাযি.)-এর নিকট তখনই হযরত উসমান (রাযি.)-এর কিসাস দাবি করেন। এ দাবি উত্থাপনকারীদের মধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাযি.)সহ হযরত তালহা (রাযি.) ও হযরত যুবাইর ইবনুল আউওয়াম (রাযি.)-এর মতো বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামও ছিলেন।

তাঁরা হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর নেতৃত্বে সেনাবাহিনীসহ মক্কা থেকে বাসরার দিকে যাত্রা করেন। সেখানে তাঁদের সমর্থকদের সংখ্যা ছিল বেশি। হযরত আলী (রাযি.)-এর তাঁর বাহিনীসহ সেখানে পৌঁছেন। বাসরার উপকণ্ঠে বিরোধী দুই বাহিনী মুখোমুখি হয়। হযরত আয়িশা (রাযি.) হযরত আলী (রাযি.)-এর কাছে তাঁর দাবি পেশ করেন। হযরত আলী (রাযি.)-এর তাঁর সমস্যাসমূহ তুলে ধরেন। যেহেতু উভয় পক্ষেই ছিল সততা ও নিষ্ঠা তাই নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

জঙ্গে জামাল

হযরত তালহা (রাযি.) ও হযরত যুবাইর ইবনুল আউওয়াম (রাযি.) ফিরে চললেন। হযরত আয়িশা (রাযি.)ও ফেরার প্রস্তুতি শুরু করলেন। কিন্তু হাঙ্গামা ও অশান্তি সৃষ্টিকারীরা উভয় বাহিনীতেই ছিল। তাই আপোষ-মীমাংসায় তারা ভীত হয়ে পড়ে। তারা সুপরিকল্পিতভাবে রাতের অন্ধকারে একপক্ষ অন্যপক্ষের শিবিরে হামলা চালিয়ে দেয়। ফল এ দাঁড়ায়, উভয়পক্ষের মনে এ ধারণা জন্মালো যে, আপোষ-মীমাংসার নামে ধোঁকা

দিয়ে প্রতিপক্ষ তাঁদের ওপর হামলা করে বসেছে। পরিপূর্ণ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। হযরত আলী (রাযি.)-এর জয় হয়। তিনি বিষয়টি হযরত আয়িশা (রাযি.)-কে বোঝাতে সক্ষম হন। হযরত আয়িশা (রাযি.) বাসরা থেকে মদীনায় ফিরে যান।

যুদ্ধের সময় হযরত আয়িশা (রাযি.) উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। ইতিহাসে তাই এ যুদ্ধ উটের যুদ্ধ নামে খ্যাত। হিজরী ৩৬ সনের জামাদিউস সানী মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আশারায়ে মুবাশশারার সদস্য হযরত তালহা (রাযি.) ও হযরত যুবাইর ইবনুল আউওয়াম (রাযি.)সহ উভয়পক্ষে মোট তের হাজার মুসলমান শহীদ হন। অবশ্য এ ব্যাপারে মতভেদ আছে। হযরত আলী (রাযি.) পনের দিন বাসরায় অবস্থানের পর কুফায় চলে যান। রাজধানী মদীনা থেকে কুফায় স্থানান্তরিত হয়।

এ উটের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের প্রথম আত্মঘাতী সংঘর্ষ। অনেক সাহাবী এ যুদ্ধে কোনো পক্ষেই যোগদান করেননি। এ আত্মঘাতী সংঘর্ষের জন্য তাঁরা ব্যথিতও হয়েছিলেন। হযরত আলী (রাযি.)-এর বাহিনী যখন মদীনা থেকে রওয়ানা হয় মদীনাবাসীরা তখন কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন।

হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর সাথে তো একটা আপোষ-রফায় আসা গেল। কিন্তু সিরিয়ার গভর্নর হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর সাথে কোনো মীমাংসায় পৌঁছা গেল না। হযরত আলী (রাযি.) তাঁকে সিরিয়ার গভর্নর পদ থেকে বরখাস্ত করেন। হযরত মুআবিয়া (রাযি.) বেঁকে বসলেন। হযরত আলী (রাযি.)-এর নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলেন। তাঁর বক্তব্যের মূলকথা ছিল, হযরত উসমান (রাযি.) হত্যার কিসাস না হওয়া পর্যন্ত তিনি হযরত আলী (রাযি.)-কে খলীফা বলে মানবেন না।

জঙ্গে সিফফীন

হিজরী ৩৭ সনের সফর মাসে সিফফীন নামক স্থানে হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর বাহিনীর মধ্যে এক সংঘর্ষ ঘটে যায়। এ সংঘর্ষ ছিল উটের যুদ্ধ থেকেও ভয়াবহ। উভয়পক্ষে মোট ৯০ হাজার মুসলমান শাহাদত বরণ করেন। তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসীর (রাযি.), হযরত খুযাইমা ইবনে সাবিত (রাযি.) ও হযরত আবু আম্মারা আল-মাযিনী (রাযি.)ও ছিলেন। তাঁরা সকলেই হযরত আলী (রাযি.)-এর পক্ষে হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর বাহিনীর হাতে শহীদ হন।

উল্লেখ্য যে, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযি.) সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন,

«وَيْحَ عَمَّارٍ، تَقْتُلُهُ الفِئَةُ الْبَاغِيَةُ».

'আফসুস! একটি বিদ্রোহী দল আম্মারকে হত্যা করবে।'[১]

সাতাশজন প্রখ্যাত সাহাবী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হযরত মুআবিয়া (রাযি.)ও হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী। অবশ্য হযরত মুআবিয়া (রাযি.) হাদীসটির ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এত কিছুর পরেও বিষয়টির ফায়সালা হলো না।

সিফফীনের সর্বশেষ সংঘর্ষে, যাকে লাইলাতুল হার বলা হয়, হযরত আলী (রাযি.)-এর জয় হতে চলেছিল। হযরত মুআবিয়া (রাযি.) পরাজয়ের ভাব বুঝতে পেরে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে মীমাংসার আহ্বান জানালেন। তাঁর সৈন্যরা বর্শার মাথায় কুরআন ঝুলিয়ে উঁচু করে ধরে বলতে থাকে, এ কুরআন আমাদের এ দ্বন্দ্বের ফায়সালা করবে। যুদ্ধ-বিরতি ঘোষিত হলো। হযরত আলী (রাযি.)-এর পক্ষে আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.) এবং হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর পক্ষে হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) হাকাম বা সালিশ নিযুক্ত হলেন।

সিদ্ধান্ত হলো, এ দু'জনের সম্মিলিত ফায়সালা বিরোধী দু'পক্ষই মেনে নেবেন। দুমাতুল জান্দাল নামক স্থানে মুসলমানদের বড় আকারের এক সম্মেলন হয়। কিন্তু সব ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে যে সিদ্ধান্তটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে, হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.)-এর সাথে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, শেষমুহূর্তে তা থেকে সরে আসায় এ সালিশী বোর্ড শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়। দুমাতুল জান্দাল থেকে হতাশ হয়ে মুসলমানরা ফিরে গেল। অতঃপর হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত মুআবিয়া (রাযি.) অনর্থক রক্তপাত বন্ধ করার লক্ষ্যে সন্ধি করলেন। এ দিন থেকে মূলত মুসলিম খিলাফত দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়।

এ সময় খারিজী নামে নতুন একটি দলের জন্ম হয়। প্রথমে তারা ছিল হযরত আলী (রাযি.)-এর সমর্থক। কিন্তু পরে তারা এ বিশ্বাস প্রচার করতে

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, ১, পৃ. ৯৭, হাদীস: ৪৪৭, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

থাকে যে, দীনের ব্যাপারে কোনো মানুষকে হাকাম বা সালিশি নিযুক্ত করা কুফরী কাজ। হযরত আলী (রাযি.) হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রাযি.)-কে হাকাম মেনে নিয়ে কুরআনের খেলাফ কাজ করেছেন। সুতরাং হযরত আলী (রাযি.) তাঁর আনুগত্য দাবি করার বৈধতা হারিয়ে ফেলেছেন। তারা হযরত আলী (রাযি.) থেকে পৃথক হয়ে যায়। তারা ছিল অত্যন্ত চরমপন্থী। তাদের সাথে হযরত আলী (রাযি.)-এর একটি যুদ্ধ হয় এবং তাতে বহু লোক হতাহত হয়।

এ খারিজী সম্প্রদায়ের তিন ব্যক্তি আবদুর রহমান মুলজিম, আল-বারাক ইবনে আবদুল্লাহ ও আমির ইবনে বকর আত-তামীমী নাহরাওয়ানের যুদ্ধের পর এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়। দীর্ঘ আলোচনার পর তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মুসলিম উম্মাহর অন্তর্কলহের জন্য দায়ী মূলত হযরত আলী (রাযি.), হযরত মুআবিয়া (রাযি.) ও হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.)। সুতরাং এ তিন ব্যক্তিকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে হবে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক মুলজিম দায়িত্ব নিল হযরত আলী (রাযি.)-এর এবং আল-বারাক ও আমর দায়িত্ব নিল যথাক্রমে হযরত মুআবিয়া (রাযি.) ও আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর। তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, মারবে নয় তো মরবে। হিজরী ৪০ সনের ১৭ রমজান ফজরের নামাযের সময়টি এ কাজের জন্য নির্ধারিত হয়। অতঃপর ইবনে মুলজিম কুফা, আল-বারাক দিমাশ্‌ক ও আমর মিসরে চলে যায়।

শাহাদত

হিজরী ৪০ সনের ১৬ রমজান শুক্রবার দিবাগত রাতে আততায়ীরা আপন আপন স্থানে ওৎ পেতে থাকে। ফজরের সময় হযরত আলী (রাযি.) অভ্যাসমত আস-সালাত বলে মানুষকে নামাযের জন্য ডাকতে ডাকতে যখন মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, পাপাত্মা ইবনে মুলজিম শাণিত তরবারি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে আহত করে। আহত অবস্থায় আততায়ীকে ধরার নির্দেশ দিলেন। সন্তানদের ডেকে অসিয়ত করলেন। চার বছর নয় মাস খিলাফত পরিচালনার পর ১৭ রমজান ৪০ হিজরী শনিবার কুফায় শাহাদত বরণ করেন।

একই দিন একই সময় হযরত মুআবিয়া (রাযি.) যখন মসজিদে যাচ্ছিলেন, তাঁরও ওপর হামলা হয়। কিন্তু তা ব্যর্থ হয়। তিনি সামান্য আহত হন। অন্য দিকে হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) অসুস্থতার কারণে সেদিন

মসজিদে যাননি। তার পরিবর্তে পুলিশ বাহিনী প্রধান খারিজ ইবনে হুযাফা ইমামতির দায়িত্ব পালনের জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন। তাঁকেই হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) মনে করে হত্যা করা হয়। এভাবে হযরত মুআবিয়া (রাযি.) ও হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) প্রাণে রক্ষা পান।[১]

হযরত আলী (রাযি.)-এর নামাযে জানাযার ইমামতি করেন হযরত হাসান ইবনে আলী (রাযি.)। কুফা জামে মসজিদের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। তবে অন্য একটি বর্ণনা মতে, নাজফে আশরাফে তাঁকে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর।

আততায়ী ইবনে মুলজিমকে ধরে আনা হলে হযরত আলী (রাযি.) নির্দেশ দেন,

إِنَّهُ أَسِيْرٌ فَأَحْسِنُوْا نُزُلَهُ، وَأَكْرِمُوْا مَثْوَاهُ، فَإِنْ بَقِيَتُ قَتَلْتُ أَوْ عَفَوْتُ، وَإِنْ مُتُّ فَاقْتُلُوْهُ قَتْلَتِيْ، وَلَا تَعْتَدُوْا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

'সে কয়েদি। তার থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা কর। আমি বেঁচে গেলে তাঁকে হত্যা অথবা ক্ষমা করতে পারি। যদি আমি মারা যাই, তোমরা তাকে ঠিক ততটুকু আঘাত করবে যতটুকু সে আমাকে করেছে। তোমরা বাড়াবাড়ি করো না। যারা বাড়াবাড়ি করে আল্লাহ তাদের ভালবাসেন না।'[২]

হযরত আলী (রাযি.) প্রায় পাঁচ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। একমাত্র সিরিয়া ও মিসর ছাড়া মক্কা ও মদীনাসহ সব এলাকা তাঁর অধীনে ছিল। তাঁর সময়টি যেহেতু গৃহযুদ্ধে অতিবাহিত হয়েছে এ কারণে নতুন কোনো অঞ্চল বিজিত হয়নি।

হযরত আলী (রাযি.) তাঁর পরে অন্য কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে যাননি। লোকেরা যখন তাঁর পুত্র হযরত হাসান (রাযি.)-কে খলীফা নির্বাচিত করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল, তিনি বলেছিলেন, এ ব্যাপারে তোমাদের নির্দেশ অথবা নিষেধ কোনোটাই করছি না। অন্য এক ব্যক্তি যখন জিজ্ঞেস করেছিল, আপনি আপনার প্রতিনিধি নির্বাচন করে যাচ্ছেন না কেন? বললেন, আমি মুসলিম উম্মাহকে এমনভাবে ছেড়ে যেতে চাই যেমন গিয়েছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)।

[১] মুহাম্মদ আল-খিযরী বেগ, ***মুহাযারাতু তারিখিল উম্মাহ আল-ইসলামিয়া***, পৃ. ৪০১–৪০২

[২] ইবনে সা'দ, ***আত-তাবাকাতুল কুবরা***, খ. ৩, পৃ. ৩৩, হাদীস: ২৮৮১

হযরত আলী (রাযি.)-এর ওফাতের পর দারুল খিলাফা রাজধানী কুফার জনগণ হযরত হাসান (রাযি.)-কে খলীফা নির্বাচন করে। তিনি মুসলিম উম্মাহর আন্তঃকলহ ও রক্তপাত পছন্দ করলেন না। এ কারণে হযরত মুআবিয়া (রাযি.) ইরাক আক্রমণ করলে তিনি যুদ্ধের পরিবর্তে হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-এর হাতে খিলাফতের ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া সমীচীন মনে করলেন। এভাবে হযরত হাসান (রাযি.)-এর নজীরবিহীন কুরবানি মুসলিম জাতিকে গৃহযুদ্ধের হাত থেকে মুক্তি দেয়। খিলাফত থেকে তাঁর পদত্যাগের বছরকে ইসলামের ইতিহাসে আমুল জামায়াত (ঐক্য ও সংহতির বছর) নামে অভিহিত করা হয়। পদত্যাগের পর হযরত হাসান কুফা ত্যাগ করে মদীনা চলে আসেন এবং নয় বছর পর হিজরী পঞ্চাশ সনে ইনতিকাল করেন। মাত্র ছয়টি মাস তিনি খিলাফত পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা

হযরত ওমর (রাযি.) আলী (রাযি.) সম্পর্কে বলেছিলেন,

أَقْضَانَا عَلِيٌّ.

'আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ফায়সালাকারী হচ্ছেন আলী।'[১]

«وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ».

'তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিচারক আলী।'[২]

তাঁর সঠিক সিদ্ধান্ত লক্ষ করে হযরত ওমর (রাযি.) একাধিকবার বলেছেন,

لَوْلَا عَلِيٌّ لَهَلَكَ عُمَرُ.

'আলী না হলে ওমর হালাক হয়ে যেত।'[৩]

ন্যায়বিচার

হযরত আলী (রাযি.) নিজেকে একজন সাধারণ মুসলমানের সমান মনে করতেন এবং যেকোনো ভুলের কৈফিয়তের জন্য প্রস্তুত থাকতেন। একবার এক ইহুদি তাঁর বর্ম চুরি করে নেয়। হযরত আলী (রাযি.) বাজারে বর্মটি

[১] ইবনে সা'দ, ***আত-তাবাকাতুল কুবরা***, খ. ২, পৃ. ২৯৩, হাদীস: ২৫৩৫–২৫৩৮

[২] ইবনে মাজাহ, ***আস-সুনান***, খ. ১, পৃ. ৫৫, হাদীস: ১৫৪

[৩] শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, ***সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম***, খ. ১, পৃ. ২৮৭

বিক্রি করতে দেখে চিনে ফেলেন। তিনি ইচ্ছা করলে জোর করে তা নিতে পারতেন। কিন্তু তা করেননি। আইন অনুযায়ী ইহুদির বিরুদ্ধে কাজীর আদালতে মামলা দায়ের করেন।

কাজীও ছিলেন কঠোর ন্যায়বিচারক। তিনি আলী (রাযি.)-এর দাবির সমর্থনে প্রমাণ চাইলেন। হযরত আলী (রাযি.) তা দিতে পারলেন না। কাজী ইহুদির পক্ষে মামলার রায় দিলেন। এ ফায়সালার প্রভাব ইহুদির ওপর এতখানি পড়েছিল যে, সে মুসলমান হয়ে যায়। সে মন্তব্য করেছিল, 'এতো নবীদের মতো ইনসাফ। আলী (রাযি.) আমীরুল মুমিনীন হয়ে আমাকে কাজীর সামনে উপস্থিত করেছেন এবং তাঁরই নিযুক্ত কাজী তাঁর বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন।'

ক্ষুধা ও দারিদ্র্য

তিনি হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর সাথে বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত রাসুলে করীম (সা.)-এর পরিবারের সাথেই থাকতেন। বিয়ের পর পৃথক বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। জীবিকার প্রয়োজন দেখা দিল। কিন্তু পুঁজি ও উপকরণ কোথায়? গতরে খেটে এবং গনীমতের হিস্‌সা থেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন। হযরত ওমর (রাযি.)-এর যুগে ভাতা চালু হলে তাঁর ভাতা নির্ধারিত হয় বছরে পাঁচ হাজার দিরহাম। হযরত হাসান (রাযি.) বলেন, মৃত্যুকালে একটি গোলাম খরিদ করার জন্য জমা করা মাত্র সাতশ' দিরহাম রেখে যান।[১]

জীবিকার অনটন হযরত আলী (রাযি.)-এর ভাগ্য থেকে কোনো দিন দূর হয়নি। একবার স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন,

«لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَإِنِّي لَأَرْبُطُ الْحَجَرَ عَلَىٰ بَطْنِيْ مِنَ الْجُوْعِ».

'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময়ে ক্ষুধার জ্বালায় পেটে পাথর বেঁধে থেকেছি।'[২]

খলীফা হওয়ার পরেও ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সাথে তাকে লড়তে হয়েছে। তবে তাঁর অন্তরটি ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত। কোনো অভাবীকে তিনি ফেরাতেন না। এজন্য তাঁকে অনেক সময় সপরিবারে অভুক্ত থাকতে হয়েছে। তিনি

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ৩৭, হাদীস: ২৮৮৭

[২] (ক) আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ৪৬৩, হাদীস: ১৩৬৭; (খ) মুহাম্মদ ইউসুফ আল-কান্ধলওয়ী, *হায়াতুস সাহাবা*, খ. ১, পৃ. ৩৭৫

ছিলেন দারুণ বিনয়ী। নিজের হাতেই ঘর-গৃহস্থালীর সবকাজ করতেন। সর্বদা মোটা পোশাক পরতেন। তাও ছেঁড়া, তালি লাগানো।

তিনি ছিলেন জ্ঞানের দরজা। দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ জ্ঞানার্জনের জন্য তাঁর কাছে এসে দেখতে পেত তিনি উটের রাখালী করছেন, ভূমি কুপিয়ে ক্ষেত তৈরি করছেন। তিনি এতই অনাড়ম্বর ছিলেন যে, সময় সময় শুধু মাটির ওপর শুয়ে যেতেন। একবার তাঁকে রাসুল (সা.) এ অবস্থায় দেখে সম্বোধন করেছিলেন, 'ইয়া আবা তুরাব (ওহে মাটির অধিবাসী প্রাকৃতজন।)' তাই তিনি পেয়েছিলেন, আবু তুরাব লকবটি।[১]

খলীফা হওয়ার পরও তাঁর এ সরল জীবন অব্যাহত থাকে। হযরত ওমর (রাযি.)-এর মতো সবসময় একটি দুররা বা ছড়ি হাতে নিয়ে চলতেন, লোকদের উপদেশ দিতেন।[২]

জ্ঞানের প্রবেশদ্বার

হযরত আলী (রাযি.) ছিলেন নবী খান্দানের সদস্য, যিনি নবী (সা.)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেন। রাসুল (সা.) বলেছেন,

«أَنَا مَدِيْنَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا».

'আমি জ্ঞানের নগরী, আর আলী সেই নগরীর প্রবেশদ্বার।'[৩]

তিনি ছিলেন কুরআনের হাফিয এবং একজন শ্রেষ্ঠ মুফাসসির। কিছু হাদীসও সংগ্রহ করেছিলেন। তবে হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। কেউ তাঁর কাছে কোনো হাদীস বর্ণনা করলে বর্ণনাকারীর নিকট থেকে শপথ নিতেন।[৪]

তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর থেকে বহু বিখ্যাত সাহাবী এবং তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী খলীফাদের যুগে মুহাজিরদের তিনজন ও আনসারদের তিনজন ফাতওয়া দিতেন। যথা– হযরত ওমর (রাযি.), হযরত উসমান (রাযি.), হযরত আলী (রাযি.), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযি.), হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযি.) ও হযরত

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৯, হাদীস: ১৫৭১

[২] ড. তাহা হুসাইন, *আল-ফিতনাতুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ১৫৯

[৩] আত-তাবারানী, *আল-মু'জামুল কবীর*, খ. ১১, পৃ. ৬৫, হাদীস: ১১০৬১, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.) থেকে বর্ণিত

[৪] আয-যাহাবী, *তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায = তাবকাতুল হুফ্‌ফায*, খ. ১, পৃ. ১৫, ক্র. ৪-৪/১

যায়েদ ইবনে সাবিত (রাযি.)।[১]

হযরত মাসরুক (রহ.) থেকে অন্য একটি বর্ণনায় জানা যায়, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময় সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ফাতওয়া দিতেন, হযরত আলী (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.), হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত (রাযি.), হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযি.), হযরত আবু মুসা আল-আশয়ারী (রাযি.)।[২]

সাহিত্য ও কবিতা

হযরত আলী ছিলেন একজন সুবক্তা ও ভালো কবি।[৩] তাঁর কবিতার একটি দিওয়ান আমরা পেয়ে থাকি। তাতে অনেকগুলো কবিতায় মোট ১৪০০ শ্লোক আছে। গবেষকদের ধারণা, তাঁর নামে প্রচলিত অনেকগুলো কবিতা প্রচলিত রয়েছে। তবে তিনি যে তৎকালীন আরবি কাব্য জগতের একজন বিশিষ্ট দিকপাল, তাতে পণ্ডিতদের কোনো সংশয় নেই। *নাহযুল বালাগা* নামে তাঁর বক্তৃতার একটি সংকলন আছে যা তাঁর অতুলনীয় বাগ্মিতার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে।[৪]

সন্তান-সন্ততি

খাতুনে জান্নাত নবী কন্যা হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর সাথে তাঁর প্রথম বিয়ে হয়। যতদিন হযরত ফাতিমা জীবিত ছিলেন, দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর মৃত্যুর পর একাধিক বিয়ে করেছেন।

হাফিয আবু জা'ফর আত-তাবারীর বর্ণনা মতে, তার চৌদ্দটি ছেলে ও সতেরটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করে। হযরত ফাতিমা (রাযি.)-এর গর্ভে তিন পুত্র হযরত হাসান (রাযি.), হযরত হুসাইন (রাযি.), হযরত মুহসিন (রাযি.) এবং দু'কন্যা হযরত যয়নাব (রাযি.) ও হযরত উম্মু কুলসুম (রাযি.) জন্মলাভ করেন। শৈশবেই হযরত মুহসিন (রাযি.) মারা যায়।[৫]

ওয়াকিদী (রহ.)-এর বর্ণনা মতে, মাত্র পাঁচ ছেলে হযরত হাসান (রাযি.), হযরত হুসাইন (রাযি.), হযরত মুহাম্মদ (ইবনুল হানাফিয়া রহ.),

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৩০২, হাদীস: ১৫৮১
[২] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ৩০৩, হাদীস: ১৫৮৬
[৩] ইবনে রশীক আল-কায়রাওয়ানী, *আল-উমদা ফী মাহাসিনিশ শি'র ওয়া আদাবিহি*, খ. ১, পৃ. ৩৪
[৪] ড. ওমর ফাররুখ, *তারিখুল আদব আল-আরবী*, খ. ১, পৃ. ৩০৯
[৫] ইবনে জরীর আত-তাবারী, *তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক = তারীখুত তাবারী*, খ. ৫, পৃ. ১৫৩

হযরত আব্বাস (রহ.) ও হযরত ওমর (রহ.) থেকে তাঁর বংশধারা চলছে।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) বলেন,

لَمْ يُنْقَلْ لِأَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ مَا نُقِلَ لِعَلِيٍّ.

'হযরত আলী (রাযি.)-এর মর্যাদা ও ফযীলত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে যত কথা বর্ণিত হয়েছে, অন্য কোনো সাহাবী সম্পর্কে তা হয়নি।'[১]

গুণাবলি

ইতিহাসে তাঁর যত গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তার কিয়দংশও তুলে ধরা সম্ভব নয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) অসংখ্যবার তাঁর জন্য ও তাঁর সন্তানদের জন্য দুআ করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

«لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا يَبْغَضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ».

'একমাত্র মুমিনরা ছাড়া তোমাকে কেউ ভালবাসবে না এবং একমাত্র মুনাফিকরা ছাড়া কেউ তোমাকে হিংসা করবে না।'[২]

হযরত আলী (রাযি.)-এর এক সাথী হযরত যিরার আস-সাদায়ী (রহ.) একদিন হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর কাছে এলেন। হযরত মুআবিয়া (রাযি.) তাঁকে হযরত আলী (রাযি.)-এর গুণাবলি বর্ণনা করতে অনুরোধ করেন। প্রথমে তিনি অস্বীকার করেন। কিন্তু হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-এর চাপাচাপিতে দীর্ঘ এক বর্ণনা দান করেন। তাতে হযরত আলী (রাযি.)-এর গুণাবলি চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে। ঐতিহাসিকরা বলছেন, এ বর্ণনা শুনে হযরত মুআবিয়া (রাযি.)-সহ তার সাথে বৈঠকে উপস্থিত সকলেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন। অতঃপর হযরত মুআবিয়া (রাযি.) মন্তব্য করেন, 'আল্লাহর কসম! আবুল হাসান (হাসানের পিতা) এমনই ছিলেন।'[৩]

আল্লাহ তাআলা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট, তিনিও আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট। এরপর পড়ুন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবীর দ্বিতীয় ভাগ, অবশিষ্ট ছয় সাহাবীর জীবনকথা।

[১] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ৪, পৃ. ৪৪৬, ক্রমিক: ৫৭০৪
[২] আত-তিরমিযী, *আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান*, খ. ৫, পৃ. ৬৪৩, হাদীস: ৩৭৩৬, হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রাযি.) থেকে বর্ণিত
[৩] ইবনে আবদুল বার্‌র, *আল-ইসতিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব*, খ. ৩, পৃ. ১১০৭, ক্রমিক: ১৮৫৫

৫
হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)

নাম-নসব ও বংশ

নাম: যুবাইর, কুনিয়াত: আবু আবদুল্লাহ ও 'হাওয়ারিউ রাসূলিল্লাহ' লকব। পিতার নাম: 'আওয়াম' এবং মাতা 'সাফিয়া বিনতু আবদুল মুত্তালিব।' মা হযরত সাফিয়া (রাযি.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ফুফু। সুতরাং হযরত যুবাইর (রাযি.) ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ফুফাতো ভাই। উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা ছিলেন তাঁর ফুফু। অন্যদিকে হযরত সিদ্দীকে আকবর হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর কন্যা হযরত আসমা (রাযি.)-কে বিয়ে করায় রাসুলুল্লাহ (সা.) ছিলেন তাঁর ভায়রা। হযরত আসমা (রাযি.) ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর বোন। এভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে ছিল তাঁর একাধিক আত্মীয়তার সম্পর্ক।

হযরত যুবাইর (রাযি.) হিজরতের আটাশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবকালীন জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তবে একথা নিশ্চিত যে, প্রথম থেকেই তাঁর মা তাঁকে এমনভাবে প্রতিপালন করেছিলেন, যাতে বড় হয়ে তিনি একজন দুঃসাহসী, দৃঢ়-সংকল্প ও আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ হন। এ কারণে প্রায়ই মা তাঁকে মারধর করতেন এবং কঠোর অভ্যাসে অভ্যস্ত করতেন। একদিন তাঁর চাচা নাওফিল ইবনে খুওয়াইলিদ তাঁর মা হযরত সাফিয়ার ওপর ভীষণভাবে ক্ষেপে গিয়ে বলেন, 'এভাবে মারতে মারতে ছেলেটাকে তুমি মেরেই ফেলবে।' তাছাড়া বনি হাশিমের লোকদের ডেকে বলেন, 'তোমরা সাফিয়াকে বোঝাওনা কেন?' জবাবে সাফিয়া বলেন,

مَنْ قَالَ: إِنِّيْ أَبْغَضُهُ فَقَدْ كَذِبْ

وَإِنَّمَا أَضْرِبُهُ لِكَيْ يَلَبْ

وَيَهْزِمَ الْجَيْشَ وَيَأْتِيْ بِالسَّلَبْ

'যারা বলে আমি তাকে দেখতে পারি না তারা মিথ্যা বলে। আমি তাকে এজন্য মারধর করি যাতে সে বুদ্ধিমান হয় এবং পরবর্তী জীবনে শত্রুসৈন্য পরাজিত করে গনীমতের মাল লাভে সক্ষম হয়।'[১]

এমন প্রতিপালনের প্রভাব অবশ্যই তাঁর ওপর পড়েছিলো। অল্প বয়স থেকেই তিনি বড় বড় পাহলোয়ান ও শক্তিশালী লোকদের সাথে কুস্তি লড়তেন। একবার মক্কায় একজন তাগড়া জোয়ানের সাথে তাঁর ধরাধরি হয়ে গেল। তাকে এমন মারই না মারলেন যে, লোকটির হাত ভেঙে গেল। লোকেরা তাঁকে ধরে হযরত সাফিয়া (রাযি.)-এর নিকট নিয়ে এসে অভিযোগ করলো। তিনি পুত্রের কাজে অনুতপ্ত হওয়া বা ক্ষমা প্রার্থনার পরিবর্তে সর্বপ্রথম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা যুবাইরকে কেমন দেখলে সাহসী না ভীরু?'[২]

ইসলাম গ্রহণ

হযরত যুবাইর (রাযি.) মাত্র ষোল বছর বয়সেই ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অনন্য ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।[৩]

যদিও তাঁর বয়স ছিল কম, তবুও দৃঢ়তা ও জীবনকে বাজি রাখার ক্ষেত্রে কারো থেকে পিছিয়ে ছিলেন না তিনি। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর একবার কেউ রটিয়ে দিয়েছিলো, মুশরিকরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বন্দী অথবা হত্যা করে ফেলেছে। একথা শুনে তিনি আবেগ ও উত্তেজনায় এতোই আত্মভোলা হয়ে পড়েছিলেন যে তক্ষুণি একটানে তরবারি কোষমুক্ত করে মানুষের ভিড় ঠেলে আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর দরবারে গিয়ে হাজির হন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে যুবাইর?' তিনি বললেন, 'শুনেছিলাম, আপনি বন্দী অথবা নিহত হয়েছেন।' রাসুলে করীম (সা.) অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁর জন্য দুআ করেন। সীরাত লেখকদের বর্ণনা, এটিই হচ্ছে প্রথম তলোয়ার যা আত্মোৎসর্গের উদ্দেশ্যে একজন বালক উন্মুক্ত করেছিলো।[৪]

---

[১] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ২, পৃ. ৪৫৮, ক্র. ২৭৯৬; (গ) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ৯৪, হাদীস: ৩০৯৫

[২] (ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ২, পৃ. ৪৫৮–৪৫৯, ক্র. ২৭৯৬

[৩] আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ৩, পৃ. ৪০৬, হাদীস: ৫৫৪৭

[৪] ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, খ. ২, পৃ. ৩০৭, ক্রমিক: ১৭৩২:

হিজরত

প্রাথমিক পর্যায়ে মক্কার অন্যান্য মুসলমানদের মতো তিনিও অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হন। তাঁর চাচা তাঁকে ইসলাম থেকে ফেরানোর জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেননি। কিন্তু তাওহীদের ছাপ যার অন্তরে একবার লেগে যায় তা কি আর মুছে ফেলা যায়? ক্ষেপে গিয়ে চাচা আরও কঠোরতা শুরু করে দেন। উত্তপ্ত পাথরের ওপর চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে এমন মারই না মারতেন যে তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যেত। তবুও তিনি বলতেন, 'যত কিছুই করুন না কেন আমি আবার কাফির হতে পারি না।'[১]

অবশেষে নিরুপায় হয়ে জন্মভূমি মক্কা ছেড়ে হাবশায় হিজরত করেন। হাবশায় কিছুকাল অবস্থানের পর মক্কায় ফিরে এলেন। এদিকে রাসুলুল্লাহ (সা.) ও মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন। তিনিও মদীনায় গেলেন।

মুসলিম ভ্রাতৃত্ব

রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কায় হযরত তালহা (রাযি.) ও হযরত যুবাইর (রাযি.)-এর মধ্যে ইসলামি ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু মদীনায় আসার পর নতুন করে হযরত সালামা ইবনে সালামা আল-আনসারী (রাযি.)-এর সাথে তাঁর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। হযরত সালামা (রযি.) ছিলেন মদীনার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব এবং আকাবায় বায়আত গ্রহণকারীদের অন্যতম।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ

যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনন্য। তিনি বদর যুদ্ধে অত্যন্ত সাহস ও নিপুণতার পরিচয় দেন। মুশরিকদের প্রতিরোধ ব্যুহ ভেঙে তছনছ করে দেন। একজন মুশরিক সৈনিক একটি টিলার ওপর উঠে।

وكان الزبير أول من سل سيفًا في الله ﷺ وكان سبب ذلك أن المسلمين لما كانوا مع النَّبِيّ ﷺ بمكة، وقع الخبر أن النَّبِيّ ﷺ قد أخذه الكفار، فأقبل الزبير يشق الناس بسيفه، والنبي ﷺ بأعلىٰ مكة، فقال له: «ما لك يا زبير»؟ قال: أخبرت أنك أخذت، فصلى عليه النَّبِيّ ﷺ ودعا له ولسيفه.

[১] (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ***আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা***, খ. ২, পৃ. ৪৫৭, ক্র. ২৭৯৬; (গ) আল-হাকিম, ***আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন***, খ. ৩, পৃ. ৪০৬, হাদীস: ৫৫৪৭:

عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: ... وَكَانَ عَمُّ الزُّبَيْرِ يُعَلِّقُ الزُّبَيْرَ فِيْ حَصِيْرٍ، وَيُدَخِّنُ عَلَيْهِ بِالنَّارِ، وَيَقُوْلُ: ارْجِعْ إِلَى الْكُفْرِ، فَيَقُوْلُ الزُّبَيْرُ: «لَا أَكْفُرُ أَبَدًا».

দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানালে হযরত যুবাইর (রাযি.) তাকে মুহূর্তের মধ্যে এমনভাবে জাপ্টে ধরেন যে, দু'জনেই গড়িয়ে নীচের দিকে আসতে থাকেন। তা দেখে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'এদের মধ্যে যে প্রথম ভূমিতে পড়বে, সে নিহত হবে।'[১] সত্যি তাই হয়েছিলো। মুশরিকটি প্রথম মাটিতে পড়ে এবং হযরত যুবাইর (রাযি.) তরবারির এক আঘাতে তাকে হত্যা করেন।

অনুরূপভাবে তিনি উবাইদা ইবনে সাঈদের মুখোমুখি হলেন। সে ছিল আপাদ-মস্তক এমনভাবে বর্মাচ্ছাদিত যে কেবল দুটি চোখই তার দেখা যাচ্ছিলো। তিনি খুব তাক করে তার চোখ লক্ষ করে তীর ছুড়লেন। নিশানা নির্ভুল হলো। তীরের ফলা এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেল। অতি কষ্টে তিনি তার লাশের ওপর বসে ফলাটি বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে তা কিছুটা বেঁকে গিয়েছিলো। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রাসুলুল্লাহ (সা.) এ তীরটি নিজেই নিয়ে নেন এবং তাঁর ইনতিকালের পর তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাযি.) পর্যন্ত এ তীরটি বিভিন্ন খলীফার নিকট রক্ষিত ছিল। হযরত উসমান (রাযি.)-এর শাহাদাতের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাযি.) তীরটি গ্রহণ করেন এবং তাঁর শাহাদাত পর্যন্ত এটি তাঁর নিকট ছিল।

বদরে তিনি এত সাংঘাতিকভাবে লড়েছিলেন যে তাঁর তরবারি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিলো এবং আঘাতে আঘাতে তাঁর সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছিলো। এ দিনের একটি ক্ষত এতো গভীর ছিল যে চিরদিনের জন্য তা একটি গর্তের মতো হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর পুত্র হযরত উরওয়া (রাযি.) বলেন, 'আমরা সেই গর্তে আঙুল ঢুকিয়ে খেলা করতাম।'[২] এ যুদ্ধে তিনি হলুদ রঙের পাগড়ি পরিহিত ছিলেন। তা দেখে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'আজ ফেরেশতাগণও এ বেশে এসেছে।'[৩]

---

[১] আলী আল-মুত্তাকী, ***কনযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল***, খ. ১৩, পৃ. ২০৮, হাদীস: ৩৬৬২৩; (খ) ইবনে আসাকির, ***তারীখু দামিশক***, খ. ১৮, পৃ. ৩৪৯:

عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: أَوَّلُ سَيْفٍ سُلَّ فِي الْإِسْلَامِ بِمَكَّةَ سَيْفُ الزُّبَيْرِ، بَلَغَه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قُتِلَ فَسَلَّ سَيْفَهُ وَقَالَ: لَا أَلْقَىٰ أَحَدًا إِلَّا قَتَلْتُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَأَخَذَ سَيْفَهُ وَمَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ.

[২] আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ৫, পৃ. ৭৬, হাদীস: ৩৯৭৩:

عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: «كَانَ فِي الزُّبَيْرِ ثَلَاثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيْفِ إِحْدَاهُنَّ فِيْ عَاتِقِهِ»، قَالَ: «إِنْ كُنْتُ لَأُدْخِلُ أَصَابِعِيْ فِيْهَا».

[৩] (ক) আলী আল-মুত্তাকী, ***কনযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল***, খ. ১৩, পৃ. ২০৯, হাদীস: ৩৬৬২৭; (খ) ইবনে আসাকির, ***তারীখু দামিশক***, খ. ১৮, পৃ. ৩৫৩:

উহুদের ময়দানে সত্য ও মিথ্যার লড়াই যখন চরম পর্যায়ে তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বীয় তরবারি কোষমুক্ত করে বললেন, 'আজ কে এর হক আদায় করবে?' সকল সাহাবীই অত্যন্ত আগ্রহের সাথে নিজ নিজ হাত বাড়ালেন। হযরত যুবাইর (রাযি.)ও তিনবার নিজের হাত বাড়ালেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা লাভের গৌরব অর্জন করেন হযরত আবু দুজানা আল-আনসারী (রাযি.)।[১]

উহুদের যুদ্ধে তীরন্দাজ সৈনিকদের অসতর্কতার ফলে যখন যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল এবং মুসলিমদের সুনিশ্চিত বিজয় পরাজয়ের রূপ নিল তখন যে চৌদ্দজন সাহাবী নিজেদের জীবনের বিনিময়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে কেন্দ্র করে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করেন হযরত যুবাইর (রাযি.) ছিলেন তাঁদের অন্যতম।[২]

খন্দকের যুদ্ধে মুসলিম নারীরা যেদিকে অবস্থান করছিলেন, সে দিকটির প্রতিরক্ষার দায়িত্বভার লাভ করেন যুবাইর (রাযি.)।[৩] এ যুদ্ধের সময় মদীনার ইহুদি গোত্র বনি কুরাইযা মুসলিমদের সাথে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তি ভঙ্গ করে। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের অবস্থা জানার জন্য কাউকে তাদের কাছে পাঠাতে চাইলেন। তিনবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তাদের সংবাদ নিয়ে আসতে পার?' প্রত্যেকবারই হযরত যুবাইর বলেন, 'আমি'। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর আগ্রহে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন, 'প্রত্যেক নবীরই থাকে হাওয়ারী। আমার হাওয়ারী যুবাইর।'[৪]

عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَ عَلَى الزُّبَيْرِ رَيْطَةٌ صَفْرَاءُ مُعْتَجِرًا بِهَا يَوْمَ بَدْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ نَزَلَتْ عَلَىٰ سِيمَا الزُّبَيْرِ».

[১] (ক) আয-যুরকানী, ***শরহুল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া***, খ. ২, পৃ. ৪০৪–৪০৫;
(খ) আল-কাস্তাল্লানী, ***আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া***, খ. ১, পৃ. ২৪৩–২৪৪;
(গ) ইবনে ইসহাক, ***আস-সিয়ার ওয়াল মাগাযী***, পৃ. ৩২৬:
قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ يَأْخُذُ هَذَا السَّيْفَ بِحَقِّهِ»؟ فَقَامَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، فَأَمْسَكَهُ عَنْهُمْ، حَتَّىٰ قَامَ إِلَيْهِ أَبُوْ دُجَانَةَ سِمَاكُ، فَقَالَ: وَمَا حَقُّهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «أَنْ تَضْرِبَ بِهِ فِيْ وَجْهِ الْعَدُوِّ حَتَّىٰ يَنْحَنِيَ، قَالَ: أَنَا آخُذُهُ بِحَقِّهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

[২] আয-যুরকানী, ***শরহুল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া***, খ. ২, পৃ. ৪১৮

[৩] আহমদ ইবনে হাম্বল, ***আল-মুসনদ***, খ. ৩, পৃ. ২৭, হাদীস: ১৪০৯

[৪] আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ৪, পৃ. ২৭–২৮, হাদীস: ২৮৪৭:

খন্দকের পর বনি কুরাইযার যুদ্ধ এবং বায়আতে রিদওয়ানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। খায়বারের যুদ্ধে তিনি অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন। খায়বারের ইহুদি নেতা মুরাহহিব নিহত হলে বিশাল দেহ ও বিপুল শক্তির অধিকারী তার ভাই ইয়াসির ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে হুঙ্কার ছেড়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানায়। হযরত যুবাইর (রাযি.) লাফিয়ে পড়লেন। তখন তাঁর মা হযরত সাফিয়া (রাযি.) বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, নিশ্চয় আজ আমার কলিজার টুকরা শহীদ হবে।' রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'না। যুবাইরই তাকে হত্যা করবে।' সত্যি সত্যি অল্পক্ষণের মধ্যে হযরত যুবাইর (রাযি.) তাকে হত্যা করেন।[১]

খায়বার বিজয়ের পর মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি চলছে। মানবীয় কিছু দুর্বলতার কারণে প্রখ্যাত সাহাবী হাতিব ইবনে আবু বালতাআ (রাযি.) সব খবর জানিয়ে মক্কার কুরাইশদের নিকট একটি চিঠি লিখলেন। চিঠিসহ গোপনে একজন মহিলাকে তিনি মক্কায় পাঠান। এদিকে ওহীর মাধ্যমে সব খবর রাসুলুল্লাহ (সা.) অবগত হলেন। তিনি চিঠিসহ মহিলাটিকে গ্রেফতারের জন্য যে দলটি পাঠান, হযরত যুবাইর (রাযি.)ও ছিলেন সে দলের একজন। চিঠিসহ মহিলাকে গ্রেফতার করে মদীনায় নিয়ে আসা হলো। হযরত হাতিব ইবনে বালতাআ (রাযি.) লজ্জিত হয়ে তওবা করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)ও তাঁকে ক্ষমা করেন।[২]

মক্কা বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহ (সা.) মুসলিম সেনাবাহিনীকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করেন। সর্বশেষ ও ক্ষুদ্রতম দলটিতে ছিলেন রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে। আর এ দলটির পতাকাবাহী ছিলেন হযরত যুবাইর (রাযি.)। রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কায় প্রবেশ করলেন। চারদিকে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এলে হযরত মিকদাদ ও হযরত যুবাইর (রাযি.) নিজ নিজ ঘোড়ার ওপর সওয়ার

عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: نَدَبَ النَّبِيُّ ﷺ النَّاسَ – قَالَ صَدَقَةُ: أَظُنُّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ – فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ، فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَ النَّاسَ، فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا وَإِنَّ حَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ».

[১] ইবনে হিশাম, ***আস-সীরাতুন নাবাবিয়া***, খ. ২, পৃ. ৩৩৪:
قَالَتْ أُمُّهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: يَقْتُلُ ابْنِيْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: «بَلْ ابْنُكَ يَقْتُلُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ»، فَخَرَجَ الزُّبَيْرُ فَالْتَقَيَا، فَقَتَلَهُ الزُّبَيْرُ.

[২] আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ৫, পৃ. ১৪৫, হাদীস: ৪২৭৪

হয়ে রাসুলে পাকের নিকট উপস্থিত হলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) উঠে দাঁড়িয়ে নিজ হাতে তাঁদের উভয়ের মুখমণ্ডলের ধুলোবালি ঝেড়ে দেন।[১]

হুনাইন যুদ্ধের সময় হযরত যুবাইর (রাযি.) কাফিরদের একটি গোপন ঘাঁটির নিকটে পৌঁছলে তারা তাঁকে অতর্কিত আক্রমণ করে। অত্যন্ত সাহসের সাথে অল্পসময়ের মধ্যে তিনি ঘাঁটিটি সাফ করে ফেলেন। তায়িফ ও তাবুকের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করে। দশম হিজরীতে বিদায় হজেও তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাযি.)-এর খিলাফতকালে সিরিয়ার ইয়ারমুক প্রান্তরে বিশাল রোমান বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এটি ছিল সিরিয়ার ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধ। হযরত যুবাইর (রাযি.) এ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের এক চরম পর্যায়ে মুসলিম সৈনিকদের এক দল সিদ্ধান্ত নিল, হযরত যুবাইর (রাযি.) রোমান বাহিনীর মধ্যভাগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাবেন এবং অন্যরা তাঁর সমর্থনে পাশে পাশে থাকবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত যুবাইর (রাযি.) ক্ষিপ্রতার সাথে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালিয়ে রোমান বাহিনীর ব্যূহ ভেদ করে অপর প্রান্তে চলে যান কিন্তু অন্যরা তাঁকে অনুসরণ করতে সক্ষম হলেন না। একাকী আবার রোমান বাহিনী ভেদ করে ফিরে আসার সময় প্রচণ্ডভাবে আক্রান্ত হয়ে ঘাড়ে দারুণভাবে আঘাত পান। হযরত উরওয়া (রহ.) বলেন, বদরের পর এটি ছিল দ্বিতীয় যখম যার মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে ছেলে বেলায় আমরা খেলতাম। তাঁর এ দুঃসাহসী আক্রমণের ফলে রোমান বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।[২]

হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) মিসরে আক্রমণ চালিয়ে ফুসতাতের কিল্লা অবরোধ করেন। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর সাহায্যে দশ হাজার সিপাহী ও চার হাজার অফিসার পাঠালেন। আর চিঠিতে লিখলেন, এসব অফিসারের এক একজন এক হাজার অশ্বারোহীর সমান। হযরত যুবাইর (রাযি.) ছিলেন এ চার হাজার অফিসারের একজন। মুসলিম সৈন্যরা সাত মাস ধরে কিল্লা অবরোধ করে আছে। জয়-পরাজয়ের কোনো সম্ভাবনা

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ১৪৬–১৪৭, হাদীস: ৪২৮০

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ৭৬, হাদীস: ৩৯৭৩:

عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: «كَانَ فِي الزُّبَيْرِ ثَلَاثُ ضَرَبَاتٍ بِالسَّيْفِ إِحْدَاهُنَّ فِيْ عَاتِقِهِ»، قَالَ: «إِنْ كُنْتُ لَأُدْخِلُ أَصَابِعِيْ فِيْهَا»، قَالَ: «ضُرِبَ ثِنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَوَاحِدَةً يَوْمَ الْيَرْمُوْكِ».

দেখা যাচ্ছে না। বিরক্ত হয়ে হযরত যুবাইর (রাযি.) একদিন বললেন, 'আজ আমি মুসলিমদের জন্য আমার জীবন কুরবান করবো।' একথা বলে উন্মুক্ত তরবারি হাতে সিঁড়ি লাগিয়ে কিল্লা প্রাচীরের মাথার ওপর উঠে পড়লেন। আরও কিছু সাহাবীও তাঁর সঙ্গী হলেন। প্রাচীরের ওপর থেকে অকস্মাৎ তাঁরা 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দিতে শুরু করেন। এ দিকে নিচ থেকে সকল মুসলিম সৈনিক একযোগে আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তোলেন। খ্রিস্টান সৈন্যরা মনে করলো, মুসলিমগণ কিল্লায় ঢুকে পড়েছে। তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়লো। একপর্যায়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে হযরত যুবাইর (রাযি.) কিল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে ফটক উন্মুক্ত করে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম বাহিনী অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। উপায়ন্তর না দেখে মিসরের শাসক মাকুকাস সন্ধির প্রস্তাব দেয় এবং তা গৃহীত হয়। সকলকে নিরাপত্তা দেওয়া হয়।[১]

হযরত ওমর (রাযি.) কর্তৃক গঠিত বোর্ডের সদস্য

হিজরী ২৩ সনে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রাযি.) এক অগ্নিউপাসকের ছুরিকাঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ছয়জন প্রখ্যাত সাহাবীর সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করে তাদের ওপর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব অর্পণ করে যান। তিনি বলেন, 'জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।' হযরত যুবাইর (রাযি.) ছিলেন এ বোর্ডের অন্যতম সদস্য।[২]

জঙ্গে জামালের ঘটনা

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাযি.)-এর খিলাফতকালে হযরত যুবাইর (রাযি.) নিরিবিলি জীবন যাপন করছিলেন। কোনো রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। আসলে বয়সও বেড়ে গিয়েছিলো। ৩৫ হিজরীতে বিদ্রোহীদের দ্বারা হযরত উসমান (রাযি.) অবরুদ্ধ হলে তাঁর নিরাপত্তার জন্য হযরত যুবাইর (রাযি.) স্বীয় পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.)-কে নিয়োগ করেন। হযরত উসমান (রাযি.) শহীদ হলে রাতের অন্ধকারে গোপনে তিনি তাঁর জানাযার নামায আদায় করে দাফন করেন।

[১] আল-বালাযূরী, *ফুতূহুল বুলদান*, পৃ. ২১২

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ১৫–১৭, হাদীস: ৩৭০০

হযরত আলী (রাযি.)-এর শাসনকালে তিনি এবং হযরত তালহা (রাযি.) মক্কায় গিয়ে হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর সাথে মিলিত হন। সেখানে তাঁরা মুসলিম উম্মাহর তৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করেন এবং মদীনায় না গিয়ে বাসরার দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বিপুলসংখ্যক লোক তাঁদের সহযোগী হয়। এদিকে হযরত আলী (রাযি.) তাঁদেরকে প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীসহ অগ্রসর হন এবং হিজরী ৩৬ সনের ১০ জমাদিউল উখরা বাসরার অনতিদূরে 'যীকার' নামক স্থানে দুই মুসলিম বাহিনী মুখোমুখি হয়। ইতিহাসে এটি উটের যুদ্ধ নামে পরিচিতি।

ইসলামি ইতিহাসের এ দুঃখজনক অধ্যায়ের বিশ্লেষণ আমাদের এ প্রবন্ধের মুখ্য বিষয় নয়। তবে একদিন যাঁরা ছিলেন ভাই ভাই, আজ তাঁরা একে অপরের খুনের পিপাসায় কাতর। ব্যাপারটি যাই হোক না কেন, এটা যে তাঁদের ব্যক্তিগত ঝগড়া ও আক্রোশের কারণে নয়, তা আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। সত্য ও সততার আবেগ-উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তাঁরা এমনটি করেছিলেন। এ কারণে আমরা দেখতে পাই, একই গোত্রের লোক তখন দু'দিকে বিভক্ত। তাছাড়া দু'পক্ষের নেতৃবৃন্দের মূল লক্ষ্যই ছিল একটা সমঝোতায় উপনীত হওয়া। আর এ কারণেই দু'পক্ষের মধ্যে দূত বিনিময়ের মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা হয়েছিলো।

আর একই কারণে আমরা দেখতে পাই, হযরত আলী (রাযি.) একাকী ঘোড়ায় চড়ে রণাঙ্গণের মাঝখানে এসে হযরত যুবাইর (রাযি.)-কে ডেকে বলছেন, 'আবু আবদুল্লাহ! তোমার কি সে দিনটির কথা মনে আছে, যে দিন আমরা দু'জন হাত ধরাধরি করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। রাসুলুল্লাহ (সা.) তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুমি কি আলীকে মুহাব্বত কর? বলেছিলে, হ্যাঁ, ইয়া রাসুলাল্লাহ! স্মরণ কর, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, 'একদিন তুমি অন্যায়ভাবে তাঁর সাথে লড়বে।' হযরত যুবাইর (রাযি.) জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, এখন আমার স্মরণ হচ্ছে।'[১]

[১] আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ৩, পৃ. ৪১২, হাদীস: ৫৫৭৩:

عَنْ إِسْمَاعِيْلِ بْنِ أَبِيْ حَازِمٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لِلزُّبَيْرِ: أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِيْ سَقِيْفَةِ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَتُحِبُّهُ؟» فَقُلْتُ: وَمَا يَمْنَعُنِيْ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّكَ سَتَخْرُجُ عَلَيْهِ وَتُقَاتِلُهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ» قَالَ: فَرَجَعَ الزُّبَيْرُ.

একটি মাত্র কথা। কথাটি বলে হযরত আলী (রাযি.) তাঁবুতে ফিরে গেলেন। এ দিকে হযরত যুবাইর (রাযি.)-এর অন্তরে ঘটে গেল এক বিপ্লব। তাঁর সকল সংকল্প ও দৃঢ়তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর কাছে এসে বললেন, আমি সম্পূর্ণ ভুলের ওপর ছিলাম। হযরত আলী আমাকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর একটি বাণী স্মরণ করে দিয়েছে। হযরত আয়িশা (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাহলে এখন ইচ্ছা কি?' তিনি বললেন, 'আমি এ ঝগড়া থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।' পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) বললেন, 'আব্বা আপনি আমাদেরকে গর্তে ফেলে আলীর ভয়ে এখন পালিয়ে যাচ্ছেন?' তিনি বললেন, 'আমি কসম করেছি, আলীর সাথে আর লড়বো না।' হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) বললেন, 'কসমের কাফ্‌ফারা সম্ভব।' এই বলে তিনি স্বীয় গোলাম মাকহুলকে ডেকে আযাদ করে দেন। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাওয়ারী হযরত যুবাইর (রাযি.) বললেন, 'বেটা! আলী আমাকে এমন কথা স্মরণ করে দিয়েছে যাতে আমার সকল উদ্যম-উৎসাহ স্তিমিত হয়ে পড়েছে। আমি সুনিশ্চিত যে, আমরা হকের ওপর নেই। এসো তুমিও আমার অনুগামী হও।' হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) অস্বীকার করলেন। হযরত যুবাইর (রাযি.) একাকী বাসরার দিকে রওয়ানা হলেন।[১]

শাহাদত

হযরত যুবাইর (রাযি.)-কে যেতে দেখে আহনাফ ইবনে কায়েস বললেন, 'কেউ জেনে এসো তো তিনি যাচ্ছেন কেন?' আমর ইবনে জারমুয বললো, 'আমি যাচ্ছি।' এই বলে সে অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে হযরত যুবাইর (রাযি.)-এর সঙ্গে মিলিত হলো। তখন তিনি বাসরা ছেড়ে একটু দূরে গিয়ে পৌঁছেছেন। কাছে এসে ইবনে জারমুয বললেন, আবু আবদুল্লাহ! জাতিকে আপনি কি অবস্থায় ছেড়ে এলেন? তারা সবাই একে অপরের গলা কাটছে। এখন কোথায় যাচ্ছেন? আমার ভুল আমি বুঝতে পেরেছি। এ কারণে এ ঝগড়া থেকে দূরে থাকার জন্য অন্য কোথাও যেতে চাই।

ইবন জারমুয বললো, 'চলুন, আমাকেও এ দিকে কিছুদূর যেতে হবে।' দু'জন এক সঙ্গে চললেন। যুহরের নামাযের সময় হযরত যুবাইর (রাযি.) থামলেন। ইবনে জারমুয বললো, 'আমিও আপনার সাথে নামায আদায় করবো। দু'জন নামাযে দাঁড়ালেন। হযরত যুবাইর (রাযি.) যেই তাঁর

[১] ইবনুল আসীর, *আল-কামিল ফিত তারীখ*, খ. ২, পৃ. ৫৯৭

মা'বুদের উদ্দেশ্যে সাজদাবনত হয়েছে, বিশ্বাসঘাতক ইবনে জারমুয অমনি তরবারির এক আঘাতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাওয়ারীর দেহ থেকে তাঁর শির বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।[১]

ইবন জারমুয হযরত যুবাইরের তরবারি, বর্ম ইত্যাদিসহ হযরত আলী (রাযি.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত গর্বের সাথে তার কৃতিত্বের বর্ণনা দিল। আলী (রাযি.) তলোয়ার খানির প্রতি অনুশোচনার দৃষ্টিতে এক নজর তাকিয়ে বললেন, 'তিনি অসংখ্যবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সম্মুখ থেকে মুসিবতের মেঘমালা অপসারণ করেছেন। ওরে ইবনে সাফিয়ার হন্তা, শুনে রাখ, জাহান্নাম তোর জন্য প্রতীক্ষা করছে।'[২]

এভাবে হযরত যুবাইর (রাযি.) হিজরী ৩৬ সনে শাহাদাত বরণ করেন এবং আস-সিবা' উপত্যকায় সমাহিত হন। তিনি ৬৪ বছর জীবন লাভ করেছিলেন।

স্বভাব-চরিত্র

হযরত যুবাইর (রাযি.) ছিলেন অত্যন্ত মহৎ চরিত্রের অধিকারী। তাকওয়া, সত্য-প্রীতি, দানশীলতা, উদারতা ও বেপরোয়াভাব ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। শিশুদের মতো তাঁর অন্তর ছিল কোমল। সামান্য ব্যাপারেই তিনি মোমের মতো বিগলিত হয়ে যেতেন। যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ۝

> 'তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল। অতঃপর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করবে।'[৩]

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমাদের এ ঝগড়ার কি পুনরাবৃত্তি হবে?' রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'হ্যাঁ। অণু-পরমাণুর হিসাব করে প্রত্যেক হকদারকে তার হক দেওয়া হবে।' একথা শুনে তার অন্তর কেঁপে ওঠে। তিনি বলে উঠলেন, 'আল্লাহু আকবর। কেমন কঠিন ব্যবস্থা হবে।'[৪]

---

[১] আবু হানিফা আদ-দীনাওয়ারী, *আল-আখবারুত তিওয়াল*, পৃ. ১৪৮

[২] আল-মাসউদী, *মুরাওয়াজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল* খ. ২, পৃ. ৩৬৪

[৩] আল-কুরআন, *আয-যুমার*, ৩৯:৩০–৩১

[৪] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ৪৫, হাদীস: ১৪৩৪:

একবার তাঁর দাস ইবরাহীমের দাদী উম্মু আতার কাছে গিয়ে তিনি দেখলেন, আইয়ামে তাশরীকের পরেও তাদের নিকট কুরবানির গোশত অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি বললেন, 'উম্মু আতা! রাসুলুল্লাহ (সা.) মুসলমানদেরকে তিনদিনের বেশি কুরবানির গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।' উম্মু আতা বললেন, 'আমি কি করবো। লোকেরা এত হাদিয়া পাঠায় যে তা শেষই হয় না।'[১]

হাদীস বর্ণনায় সতর্কতা

হযরত যুবাইর (রাযি.) যদিও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাওয়ারী ও সার্বক্ষণিক সহচর ছিলেন, তবুও আল্লাহ-ভীতি ও সতর্কতার কারণে খুব কমই হাদীস বর্ণনা করতেন। একদিন পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'আব্বা, অন্যদের মতো আপনি বেশি বেশি হাদীস বর্ণনা করেন না এর কারণ কি?' তিনি বললেন, 'বেটা! অন্যদের থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য ও বন্ধুত্ব আমার কোনো অংশে কম ছিল না। যেদিন ইসলাম গ্রহণ করেছি সেদিন থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহচর্য হতে বিচ্ছিন্ন হইনি, কিন্তু তাঁর এ সতর্কবাণীটি আমাকে দারুণভাবে সতর্ক করেছে, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার আবাসস্থল নির্ধারণ করে নেয়।'[২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّوْرَةُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَّإِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ۝ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ۝ ﴾ [الزمر: ٣١] قَالَ الزُّبَيْرُ: أَيْ رَسُوْلَ اللهِ أَيُكَرِّرُ عَلَيْنَا مَا كَانَ بَيْنَنَا فِي الدُّنْيَا مَعَ خَوَاصِّ الذُّنُوْبِ؟ قَالَ: «نَعَمْ لَيُكَرَّرَنَّ عَلَيْكُمْ حَتَّىٰ يُؤَدَّى إِلَىٰ كُلِّ ذِيْ حَقٍّ حَقُّهُ»، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنَّ الْأَمْرَ لَشَدِيْدٌ.

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ৩৮, হাদীস: ১৪২২:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ أُمِّ عَطَاءٍ، قَالَتَا: وَاللهِ لَكَأَنَّنَا نَنْظُرُ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، حِيْنَ أَتَانَا عَلَىٰ بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ فَقَالَ: يَا أُمَّ عَطَاءٍ، «إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَى الْمُسْلِمِيْنَ أَنْ يَأْكُلُوْا مِنْ لُحُوْمِ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلَاثٍ»، قَالَ: فَقُلْتُ: بِأَبِيْ أَنْتَ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا أُهْدِيَ لَنَا، فَقَالَ: «أَمَّا مَا أُهْدِيَ لَكُنَّ فَشَأْنَكُنَّ بِهِ».

[২] আবু দাউদ, *আস-সুনান*, খ. ৩, পৃ. ৩১৯–৩২০, হাদীস: ৩৬৫১:

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُحَدِّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَمَا

সাম্যের প্রতি অনুরাগ

ইসলামি সাম্যের প্রতি তিনি এত বেশি সতর্ক ছিলেন যে, দু'জন মুসলিম মৃতের মধ্যেও একজনকে সামান্য প্রাধান্য দান তিনি বৈধ মনে করেননি। উহুদের যুদ্ধে তাঁর মামা হযরত হামযা (রাযি.) শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মা হযরত সাফিয়া (রাযি.) ভাইয়ের কাফনের জন্য দু'প্রস্থ কাপড় নিয়ে আসেন। কিন্তু মামার পাশেই একজন আনসারী ব্যক্তির লাশ ছিলো। একটি লাশের জন্য দুটি কাপড় হবে আর অন্যটি থাকবে কাফনহীন ব্যাপারটি তিনি মেনে নিতে পারেননি। উভয়ের মধ্যে ভাগ করার জন্য কাপড় দুটিকে মাপলেন। ঘটনাক্রমে কাপড় দু'খানা ছিল ছোট-বড়। যাতে কারো প্রতি পক্ষপাতিত্ব না হয়, সে জন্য লটারির মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তি করেন।[১]

সাহসিকতা

হযরত যুবাইর (রাযি.) যেকোনো ধরণের বিপদ-আপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। মৃত্যু-ভয় তাঁর দৃঢ় সংকল্পে কোনোদিন বিন্দুমাত্র ফাটল ধরাতে পারেনি। ইসকান্দারিয়া অবরোধের সময় তিনি সিঁড়ি লাগিয়ে কিল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চাইলেন। সঙ্গীরা বললেন, 'ভেতরে মারাত্মক প্লেগ।' জবাবে বললেন, 'আমরা তো যখম ও প্লেগের জন্যই এসেছি। সুতরাং মৃত্যুভয় কেন?' সেদিন তিনি ভীষণ সাহসিকতার সঙ্গে সিঁড়ি লাগিয়ে কিল্লায় প্রবেশ করেছিলেন।

আমানতদারিতা

হযরত যুবাইর (রাযি.)-এর সততা, আমানতদারি, পরিচালনা ক্ষমতা ও সংগঠন যোগ্যতা ছিল অসাধারণ। মৃত্যুকালে লোকেরা তাঁকে আপন আপন সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদের মুহাফিয বানানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করতো। হযরত মুতী' ইবনুল আসওয়াদ (রহ.) তাঁকে অসী বানাতে চাইলে তিনি অস্বীকৃতি জানান। তখন তিনি কাতরকণ্ঠে বলতে থাকেন, 'আমি আপনাকে আল্লাহ,

---

يُحَدِّثُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كَانَ لِيْ مِنْهُ وَجْهٌ وَمَنْزِلَةٌ، وَلَكِنِّيْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ২, পৃ. ৩৪, হাদীস: ১৪১৮

রাসুল ও নিকটাত্মীয়তার দোহাই দিয়ে বলছি। আমি ফারুকে আযম ওমর (রাযি.)-কে বলতে শুনেছি, যুবাইর দীনের একটি রুকন বা স্তম্ভ।[১]

হযরত উসমান (রাযি.), হযরত মিকদাদ (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম মৃত্যুকালে তাঁকে অসী নিযুক্ত করেছিলেন। অত্যন্ত সততার সাথে তিনি তাঁদের ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ করে তাঁদের সন্তান ও পরিবার-পরিজনদের জন্য ব্যয় করেন।[২]

সন্তানদের স্নেহ

হযরত যুবাইর (রাযি.) স্ত্রী ও ছেলে-সন্তানদের গভীরভাবে ভালবাসতেন। বিশেষত পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাযি.) ও তাঁর সন্তানদেরকে অতিমাত্রায় স্নেহ করতেন। মৃত্যুর পূর্বে সন্তানদের তা'লীম ও তারবিয়াতের ব্যাপারে তিনি ছিলেন দারুণ সচেতন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি পুত্র আবদুল্লাহ (রাযি.)-কে সঙ্গে নিয়ে যান। তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ বছর। হযরত যুবাইর (রাযি.) তাঁকে একটি ঘোড়ার ওপর বসিয়ে একজন সিপাহীর তত্ত্বাবধানে দিয়ে দেন, যাতে সে যুদ্ধের ভয়াবহ দৃশ্যগুলো দেখিয়ে তাঁকে বীরত্ব ও সাহসিকতার শিক্ষা দেয়।

দানশীলতা ও বদান্যতা

বদান্যতা, দানশীলতা ও আল্লাহর রাস্তায় খরচের ব্যাপারে তিনি অন্য কারো থেকে কখনো পিছিয়ে থাকেননি। তাঁর এক হাজার দাস ছিল। প্রতিদিন তিনি তাদের ভাড়া খাটিয়ে মোটা অঙ্কের অর্থ লাভ করতেন। কিন্তু তার একটি পয়সাও নিজের বা পরিবারবর্গের জন্য ব্যয় করা সমীচীন মনে করতেন না। সবই বিলিয়ে দিতেন। মোটকথা নবীর একজন হাওয়ারীর মধ্যে যত রকমের গুণ থাকা সম্ভব, সবই হযরত যুবাইরের মধ্যে ছিল।

---

[১] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ২, পৃ. ৪৬০, ক্র. ২৭৯৬:
عن مطيع بن الأسود أنه أوصىٰ إلى الزّبير فأبىٰ، فقال: أسألك بالله والرحم إلّا ما قبلت، فإنّي سمعت عمر يقول: إن الزبير ركن من أركان الدّين.

[২] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ২, পৃ. ৪৬০, ক্র. ২৭৯৬

ব্যবসা-বাণিজ্য

ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল হযরত যুবাইরের প্রধান পেশা। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, যে ব্যবসায়ে তিনি হাত দিয়েছেন, কখনো তাতে লোকসান হয়নি।

আল্লাহর রাস্তায় ত্যাগ

আল্লাহর রাহে সংগ্রামে দুশমনদের তীর-বর্শার অসংখ্য আঘাত তিনি খেয়েছেন। হযরত আলী ইবনে খালিদ (রহ.) বলেন, আমাদের কাছে মুসেল থেকে একটি লোক এসেছিলো। সে বর্ণনা করলো, 'আমি যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.)-এর একজন সফর-সঙ্গী ছিলাম। সফরের একপর্যায়ে আমি তাঁর দেহের এমন সব ক্ষতিচিহ্ন দেখতে পেলাম যা অন্য কারো দেহে আর কখনো দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এসবই ঘটেছে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে ও আল্লাহর রাহে।'

হযরত আলী ইবনে যায়েদ (রহ.) বলেন, 'যুবাইরকে দেখেছে এমন এক ব্যক্তি আমাকে বলেছে, 'তাঁর বুকে ঝরণার মতো দেখতে তীর বর্শার অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন ছিল।'

পোশাক-পরিচ্ছদ

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাদাসিধে। তবে তাঁর তরবারিটি ছিল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ। তরবারির হাতলটি ছিল চমৎকার নকশা অঙ্কিত।

ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা

হযরত মুআবিয়া (রাযি.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তালহা ও যুবাইর সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাদের দু'জনের ওপর রহমত বর্ষন করুন। আল্লাহর কসম, তাঁরা দু'জনই ছিলেন অত্যন্ত সংযমী, পূণ্যবান, সৎকর্মশীল, আত্মসমর্পণকারী, পুত-পবিত্র, পবিত্রতা অর্জনকারী ও শাহাদাত বরণকারী।'

হযরত যুবাইর (রাযি.) বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) আমার জন্য এবং আমার সন্তান-সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রীদের জন্য দুআ করেছেন।'

হযরত যুবাইর (রাযি.)-এর সবচেয়ে বড় পরিচয় ও সৌভাগ্য এই যে, তিনি আশারায়ে মুবাশশারা অর্থাৎ দুনিয়াতে জান্নাতের শুভ সংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন।

৬
হযরত তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাযি.)

নাম-নসব ও বংশ

আবু মুহাম্মদ তালহা তাঁর নাম। পিতা: উবাইদুল্লাহ এবং মাতা: সা'বা। কুরাইশ গোত্রের তাইম শাখার সন্তান। হযরত আবু বকর (রাযি.)ও ছিলেন এ তাইম কবীলার লোক। তাঁর মা সা'বা ছিলেন প্রখ্যাত শহীদ সাহাবী হযরত আলা ইবনুল হাযরামী (রাযি.)-এর বোন।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত তালহা (রহ.) ইসলামের সূচনা পর্বেই মাত্র পনেরো বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.)-এর দাওয়াতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। জাহিলী যুগে হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর বাড়িতে অনুষ্ঠিত বৈঠকের তিনি ছিলেন নিয়মিত সদস্য।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি বড় চমকপ্রদ। তিনি গেছেন কুরাইশদের বাণিজ্য কাফিলার সাথে সিরিয়া। তাঁরা যখন বাসরা শহরে পৌঁছলেন, দলের অন্য কুরাইশ ব্যবসায়ীরা তাঁর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাজারের বিভিন্ন স্থানে কেনা-বেচায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তিনি বাজারের মধ্যে ঘুরাফেরা করছেন এমন সময় যে ঘটনাটি ঘটলো তা তালহার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। তিনি বলেন, আমি তখন বাসরার বাজারে। একজন খ্রিস্টান পাদরিকে ঘোষণা করতে শুনলাম, ওহে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! আপনারা এ বাজারে আগত লোকদের জিজ্ঞাসা করুন, তাদের মধ্যে মক্কাবাসী কোনো লোক আছে কিনা।

আমি নিকটেই ছিলাম। দ্রুত তার কাছে গিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, আমি মক্কার লোক।' জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের মধ্যে আহমদ কি আত্মপ্রকাশ করেছেন?' বললাম 'কোন আহমদ?' বললেন, 'আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র। যে মাসে তিনি আত্মপ্রকাশ করবেন, এটা সেই মাস। তিনি হবেন শেষ নবী। মক্কায় আত্মপ্রকাশ করে কালো পাথর ও খেজুর উদ্যানবিশিষ্ট ভূমির দিকে হিজরত করবেন। যুবক, খুব তাড়াতাড়ি তোমার

তাঁর কাছে যাওয়া উচিৎ।' হযরত তালহা (রাযি.) বলেন, 'তাঁর একথা আমার অন্তরে দারুণ প্রভাব সৃষ্টি করলো। আমি আমার কাফিলা ফেলে রেখে বাহনে সওয়ার হলাম। বাড়িতে পৌঁছেই পরিবরের লোকদের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার যাওয়ার পর মক্কায় নতুন কিছু ঘটেছে কি? তারা বললো, 'হ্যাঁ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ নিজেকে নবী বলে দাবি করেছেন এবং আবু কুহাফার ছেলে আবু বকর তাঁর অনুসারী হয়েছেন।'

হযরত তালহা (রাযি.) বলেন, আমি হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, একথাকি সত্যি যে, মুহাম্মদ নুবুওয়াত দাবি করেছেন এবং আপনি তাঁর অনুসারী হয়েছেন? বললেন, হ্যাঁ, তারপর তিনি আমাকেও ইসলামের দাওয়াত দিলেন। আমি তখন খ্রিস্টান পাদরির ঘটনা তাঁর কাছে খুলে বললাম। অতঃপর তিনি আমাকে সঙ্গে করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট নিয়ে গেলেন। আমি সেখানে কালিমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলাম এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট পাদরির কথা সবিস্তারে বর্ণনা করলাম। শুনে তিনি দারুণ খুশি হলেন। এভাবে আমি হলাম হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণকারী চতুর্থ ব্যক্তি।[১]

হযরত তালহা (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণে তাঁর মা বড় বেশি হৈ-চৈ শুরু করলেন। কারণ তাঁর বাসনা ছিল, ছেলে হবে গোত্রের নেতা। গোত্রীয় লোকেরা তাঁকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য চাপাচাপি করে দেখলো

---

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ১৯৬, হাদীস: ৩৫৭৫:

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ : قَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: حَضَرْتُ سُوْقَ بُصْرَىٰ، فَإِذَا رَاهِبٌ فِيْ صَوْمَعَتِهِ يَقُوْلُ : سَلُوْا أَهْلَ هَذَا الْمَوْسِمِ : أَفِيْهِمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرَمِ؟ قَالَ طَلْحَةُ : فَقُلْتُ : نَعَمْ، أَنَا، فَقَالَ: هَلْ ظَهَرَ أَحْمَدُ بَعْدُ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَنْ أَحْمَدُ؟ قَالَ : ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، هَذَا شَهْرُهُ الَّذِيْ يَخْرُجُ فِيْهِ، وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَمَخْرَجُهُ مِنَ الْحَرَمِ وَمُهَاجَرُهُ إِلَىٰ نَخْلٍ وَحَرَّةٍ وَسِبَاخٍ فَإِيَّاكَ أَنْ تُسْبَقَ إِلَيْهِ، قَالَ طَلْحَةُ: فَوَقَعَ فِيْ قَلْبِيْ مَا قَالَ فَخَرَجْتُ سَرِيْعًا حَتَّىٰ قَدِمْتُ مَكَّةَ فَقُلْتُ: هَلْ كَانَ مِنْ حَدَثٍ؟ قَالُوْا : نَعَمْ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَمِيْنُ تَنَبَّأَ وَقَدْ تَبِعَهُ ابْنُ أَبِيْ قُحَافَةَ، قَالَ : فَخَرَجْتُ حَتَّىٰ دَخَلْتُ عَلَىٰ أَبِيْ بَكْرٍ، فَقُلْتُ: أَتَبِعْتَ هَذَا الرَّجُلَ؟ قَالَ : نَعَمْ، فَانْطَلِقْ إِلَيْهِ فَادْخُلْ عَلَيْهِ فَاتْبَعْهُ فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الْحَقِّ. فَأَخْبَرَهُ طَلْحَةُ بِمَا قَالَ الرَّاهِبُ فَخَرَجَ أَبُوْ بَكْرٍ بِطَلْحَةَ فَدَخَلَ بِهِ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأَسْلَمَ طَلْحَةُ، وَأَخْبَرَ رَسُوْلَ اللهِ بِمَا قَالَ الرَّاهِبُ، فَسُرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ.

তিনি পাহাড়ের মতো অটল। সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না ভেবে তারা নির্যাতনের পথ বেছে নিল।

মাসউদ ইবনে খারাশ বলেন, 'একদিন আমি সাফা-মারওয়ার মাঝখানে দৌড়াচ্ছি, এমন সময় দেখলাম, একদল লোক হাত বাঁধা একটি যুবককে ধরে টেনে নিয়ে আসছে। তারপর তাকে উপুড় করে শুইয়ে তার পিঠে ও মাথায় বেদম মার শুরু করলো। তাদের পেছনে একজন বৃদ্ধ মহিলা চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে তাকে গালাগালি দিচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ছেলেটির এ অবস্থা কেন? তারা বললো, এ হচ্ছে তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ। পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে বনি হাশিমের সেই লোকটির অনুসারী হয়েছে। এ মহিলাটি কে? তারা বললো, সা'বা বিনতুল হাযরামী যুবকটির মা।'

কুরাইশদের সিংহ বলে পরিচিত নাওফিল ইবনে খুয়াইলিদ হযরত তালহা (রাযি.)-এর কাছে এলো। তাঁকে একটি রশি দিয়ে বাঁধলো এবং সেই একই রশি দিয়ে বাঁধলো হযরত আবু বকর (রাযি.)-কেও। তারপর তাদের দু'জনকে সোপর্দ করলো মক্কার গোঁয়ার লোকদের হাতে নির্যাতন চালানো জন্য। একই রশিতে তাঁদের দু'জনকে বাঁধা হয়েছে তাই তাঁদেরকে বলা হয় 'কারীনান'।

ইসলাম গ্রহণের পর এভাবে তিনি আপনজন ও কুরাইশদের যুগ্নঅত্যাচারের শিকার হন। দীর্ঘ তেরো বছর অসীম ধৈর্যের সাথে সবকিছু সহ্য করেন এবং একনিষ্ঠভাবে ইসলামের তাবলীগ ও প্রচারের কাজ চালিয়ে যান। তিনি মক্কার আশ-পাশের উপত্যকায় বিদেশি অভ্যাগতদের সন্ধান করতেন, বেদুঈনদের তাঁবু এবং শহরের পরিচিত অংশীবাদীদের গৃহে চুপিসারে উপস্থিত হয়ে তাদের নিকট দীনের দাওয়াত পৌঁছাতেন। মক্কার দারুল আরকামে অন্যদের মতো তিনিও নিয়মিত যেতেন। ইসলাম ও মুসলমানদের এ দুঃসময়ে আল্লাহর দীনের জন্য তিনি সম্ভাব্য সব ধরণের চেষ্টা ও সাধনা করেছেন।

হিজরত

৬২২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে হযরত আবু বকর (রাযি.)-কে সঙ্গে করে রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন। তাঁদের এ দুর্গম সফরের পথপ্রদর্শক ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে উরায়কাত। তিনি তাঁদেরকে মদীনায় পৌঁছে দিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন এবং হযরত আবু বকর (রাযি.)-

এর পুত্র আবদুল্লাহর নিকট তাঁদের সফরের কাহিনি সবিস্তারে বর্ণনা করেন। হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর পরিবার-পরিজন মদীনায় হিজরতের প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন সময় হযরত তালহা (রাযি.) ও হযরত সুহায়েব ইবনে সিনান (রাযি.) তাঁদের সাথে যোগ দেন। হযরত তালহা (রাযি.) হলেন সেই কাফিলার আমীর। মদীনায় উপস্থিত হয়ে হযরত তালহা (রাযি.) ও হযরত সুহায়েব (রাযি.) হযরত আসআদ ইবনে যারারা (রাযি.)-এর বাড়িতে অবস্থান করতে থাকেন।[১]

মুসলিম ভ্রাতৃত্ব

হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.) বলেন, হিজরতের পূর্বে মক্কায় হযতর তালহা (রাযি.) ও হযরত যুবাইর (রাযি.)-এর মধ্যে রাসুলুল্লাহ (সা.) ভ্রাতৃ-সম্পর্ক কায়েম করে দিয়েছিলেন এবং হিজরতের পর মদীনার প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রাযি.)-এর সাথে তাঁর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অবশ্য অন্য একটি বর্ণনায় জানা যায়, রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রাযি.)-এর সাথে তাঁর ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন এবং আপন ভাইয়ের মতো আমরণ তাঁদের এ সম্পর্ক অটুট ছিল।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ

বদর যুদ্ধে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ না করলেও পরোক্ষভাবে করেছিলেন। এ কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে গনীমতের হিসসা দিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় একদল কাফির মদীনার মুসলিম জনপদের ওপর আক্রমণের ষড়যন্ত্র করেছিল। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য হযরত তালহা (রাযি.)-কে পাঠিয়েছিলেন। হযরত তালহা (রাযি.) ছাড়াও সাত ব্যক্তিকে রাসুলুল্লাহ (সা.) বিভিন্ন দায়িত্ব দিয়ে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছিলেন। এ কারণে প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা যুদ্ধে শরীক হতে পারেননি। তবে তাঁদেরকে বদরী হিসেবে গণ্য করা হয়।

হিজরী তৃতীয় সালে মক্কার মুশরিকদের সাথে সংঘটিত হয় উহুদের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে হযরত তালহা (রাযি.) বীরত্ব ও সাহসিকতার নজীরবিহীন রেকর্ড স্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন উহুদ যুদ্ধের হিরো।

---

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ১৯৭, হাদীস: ৩৫৭৭

তীরন্দাজ বাহিনীর ভুলের কারণে মুসলিম বাহিনী যখন দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন তখন যে ক'জন মুষ্টিমেয় সৈনিক আল্লাহর রাসুলকে ঘিরে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন, হযরত তালহা (রাযি.) তাঁদের অন্যতম।

এ সময় হযরত আম্মার ইবনে ইয়াযিদ (রাযি.) শহীদ হন। হযরত কাতাদা ইবনে নু'মার (রাযি.)-এর চোখে কাফিরের নিক্ষিপ্ত তীর লাগলে চক্ষু কোটর থেকে মণিটি বের হয়ে তাঁর গণ্ডের ওপর ঝুলতে থাকে। হযরত আবু দুজানা (রাযি.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে তাঁর পুরো দেহটি ঢাল বানিয়ে নেন। এ সময় সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.) অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তীর ছুড়ছিলেন। আর হযরত তালহা (রাযি.) এক হাতে তলোয়ার ও অন্য হাতে বর্শা নিয়ে কাফিরদের ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালান।

যুদ্ধের একপর্যায়ে আনসারদের বারোজন এবং মুহাজিরদের একজন হযরত তালহা ছাড়া আর সকলে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। রাসুলুল্লাহ (সা.) পাহাড়ের একটি চূড়ায় উঠলেন, এমন সময় একদল শত্রুসৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেললো। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সঙ্গের লোকদের বললেন, 'যে এদের হটিয়ে দিতে পারবে, জান্নাতে সে হবে আমার সাথী।' তালহা বললেন, আমি যাব ইয়া রাসুলাল্লহ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'না, তুমি থাম।' একজন আনসারী বললো, আমি যাব। বললেন, 'হ্যাঁ, যাও।' আনসারী গেলেন এবং মুশরিকদেরসাথে যুদ্ধ করে শহীদ হলেন।

এভাবে বার বার রাসুলুল্লাহ (সা.) আহ্বান জানালেন এবং প্রত্যেক বারই, হযরত তালহা (রাযি.) যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে নিবৃত্ত করে একজন আনসারীকে পাঠালেন। এভাবে এক এক করে যখন আনসারীদের সকলে শাহাদাৎ বরণ করলেন, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত তালহা (রাযি.)-কে বললেন, 'এবার তোমার পালা, যাও।'

হযরত তালহা (রাযি.) আক্রমণ চালালেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) আহত হলেন, তাঁর দান্দান মুবারক শহীদ হলো এবং তিনি রক্তে রঞ্জিত হয়ে পড়লেন। এ অবস্থায় হযরত তালহা (রাযি.) একাকী একবার মুশরিকদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে একটু দূরে তাড়িয়ে দেন, আবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দিকে ছুটে এসে তাকে কাঁধে করে পাহাড়ের ওপরের দিকে উঠতে থাকেন এবং এক স্থানে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে রেখে আবার নতুন করে হামলা চালান। এভাবে সেদিন তিনি মুশরিকদের প্রতিহত করেন।

হযরত আবু বকর (রাযি.) বলেন, এ সময় আমি ও হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে দূরে সরে পড়েছিলাম। কিছুক্ষণ পর আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ফিরে এসে তাঁকে সেবার জন্য এগিয়ে গেলে তিনি বললেন, 'আমাকে ছাড়, তোমাদের বন্ধু তালহাকে দেখো।' আমরা তাকিয়ে দেখি, তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় একটি গর্তে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তাঁর একটি হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রায় এবং সারা দেহে তরবারি ও তীর বর্শার সত্তরটির বেশি আঘাত।

তাই পরবর্তীকালে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, যদি কেউ কোনো মৃত ব্যক্তিকে পৃথিবীতে হেঁটে বেড়াতে দেখে আনন্দ পেতে চায়, সে যেন তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহকে দেখে। এ কারণে তাঁকে জীবিত শহীদ বলা হতো। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযি.) উহুদ যুদ্ধের প্রসঙ্গ উঠলেই বলতেন, 'সে দিনটির সবটুকুই তালহার।' এ যুদ্ধে হযরত তালহা (রাযি.)-এর কাছে আল্লাহর রাসুল (সা.) এত প্রীত হন যে তিনি তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউসের সুসংবাদ দান করেন।[১]

পঞ্চম হিজরী সনের যিলকাদ মাসে আরবের বিভিন্ন গোত্র ও ইহুদিদের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা আক্রমণের তোড়জোড় শুরু করে। এদিকে তাদেরকে প্রতিহত করার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নেতৃত্বে মুসিলম বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে সালা পর্বতের পাশ দিয়ে পূর্ব পশ্চিমে পাঁচ হাত গভীর খন্দক খননের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ খন্দক খননের কাজে হযরত তালহা (রাযি.)-কে ব্যস্ত দেখা যায়। খন্দক খননের কাজ শেষ হতে না হতেই মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য আরব গোত্রের সম্মিলিত বাহিনী মদীনা অবরোধ করে। এদিকে মদীনার অভ্যন্তরে ইহুদি গোত্রগুলো বিশেষত বনি কুরাইযা চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে।

এ সময় মুসলমানরা ভিতর ও বাইরের শত্রু দ্বারা পরিবেষ্টিত। এমন এক নাজুক পরিস্থিতিতে কিছুসংখ্যক মুসলমান স্ত্রী-পুত্র পরিজনের নিরাপত্তার চিন্তায় স্বাভাবিকভাবেই একটু অস্থির হয়ে পড়েন। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমানের মনোবল এবং আল্লাহর প্রতি তাঁদের ঈমান অটল থাকে। তাঁরা নিজেদের জান-মাল সবকিছু আল্লাহর পথে কুরবানি করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। হযরত তালহা (রাযি.) ছিলেন শেষোক্ত দলের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ১৯৮, হাদীস: ৩৫৮১–৩৫৯০

তাআলা সুরা আল-আহযাবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় রুকুতে মুসলমানদের এ সময়কার মানসিক চিত্র সুন্দরভাবে অঙ্কন করেছেন।

খন্দকের ধারে দাঁড়িয়ে কতিপয় মুসলমান আলাপ-আলোচনা করছে। হযরত তালহা (রাযি.) যাচ্ছেন পাশ দিয়ে। তাঁর কানে ভেসে এলো, একজন বলছে, আমাদের স্ত্রী পরিজনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা উচিৎ। হযরত তালহা (রাযি.) একটু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আল্লাহু খায়রুন হাফিযীন (আল্লাহ সর্বোত্তম নিরাপত্তা বিধানকারী)। যারা নিজেদের শক্তি ও বাহুবলের ওপর ভরসা করেছে, ব্যর্থ হয়েছে। লোকেরা বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারা তাদের উদ্দেশ্য থেকে বিরত থাকলো।'

বায়আতে রিদওয়ান, খায়বার ও মুতাসহ সব অভিযানেই তিনি অংশগ্রহণ করে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। মক্কা বিজয়ের দিন মুহাজিরদের যে ক্ষুদ্র দলটির সাথে রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কায় প্রবেশ করেন হযরত তালহা (রাযি.) ছিলেন সেই দলে এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথেই তিনি পবিত্র কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।

দশম হিজরী সনের ২৫ যুলকা'দা রাসুলুল্লাহ (সা.) হজের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে যাত্রা শুরু করেন। এটিই ছিল ঐতিহাসিক বিদায়হজ। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সফরসঙ্গী হন হযরত তালহা (রাযি.)ও। তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে যুল হুলায়ফা পৌঁছে ইহরাম বাঁধেন। এ সফরে একমাত্র রাসুলুল্লাহ (সা.) ও হযরত তালহা (রাযি.) ছাড়া আর কারও সঙ্গে কুরবানির পশু ছিল না।[১]

হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর আমলে

প্রিয়নবীর ইন্তিকালে হযরত তালহা (রাযি.) দারুণ আঘাত পান। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর শোকে তিনি কাতর হয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে বলতেন, আল্লাহ তাআলা সকল মুসীবতে ধৈর্য ধরার হুকুম দিয়েছেন, তাই তাঁর বিচ্ছেদে 'সবরে জামীল' অবলম্বনের চেষ্টা করি এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কাছে তাওফীকও কামনা করি।'

হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর খিলাফতকালে তিনি তাঁর বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন। চিন্তা, পরামর্শ ও কাজের মাধ্যমে সব ব্যাপারে তিনি তাঁকে

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ১৫৯, হাদীস: ১৬৫১

সাহায্য করেন। রিদ্দার যুদ্ধের সময় অনেক বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম যাকাত আদায় করতে অস্বীকারকারী বেদুইনদের সাথে কিছুটা কোমল আচরণ করার জন্য এবং তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা না করার জন্য প্রথমত খলীফাকে পরামর্শ দেন। কিন্তু হযরত তালহা স্পষ্ট করে বলে দেন, 'যে দীনে যাকাত থাকবে না তা সত্য ও সঠিক হতে পারে না।'

হিজরী ১৩ সনের জামাদিউস সানী মাসে হযরত আবু বকর (রাযি.) অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে লাগলো। একদিন হযরত তালহা (রাযি.) গেলেন তাঁকে দেখতে। তিনি উপস্থিত হলে কিছুক্ষণ নিরবতার পর উভয়ের মধ্যে নিম্নোক্ত কথা হয়:

- ওমরকে কি স্থলাভিষিক্ত করবো? আবু মুহাম্মদ (তালহা), আপনার মত কি?
- সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ওমর সর্বোত্তম গুণের অধিকারী তিনি সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী।
- তাঁকে আমার স্থলাভিষিক্ত করার ব্যাপারে আমি আপনার পরামর্শ চেয়েছি।
- তাঁর স্বভাবে কিছুটা কঠোরতা আছে এবং তিনি একটু বেশি কড়াকড়ি আরোপ করে থাকেন।
- তাঁর মধ্যে কি কি ত্রুটি আছে?
- আপনার সময়ে তিনি যখন এত কঠোর, আপনার পরে স্বীয় দায়িত্বানুভূতিতে না জানি কত বেশি কঠোর হয়ে পড়েন।
- তাঁর ওপর যখন খিলাফতের গুরু দায়িত্ব এসে পড়বে, তিনি নরম হয়ে যাবেন।

সবশেষে হযরত তালহা (রাযি.) বললেন, তাঁর গুণাবলি ও যোগ্যতা যে সকলের থেকে বেশি, সে ব্যাপারে আমার দ্বিমত নেই। তাঁর স্বভাবের একটি দিক সম্পর্কে আমার যা প্রতিক্রিয়া তা ব্যক্ত করতে আমি কার্পণ্য করিনি। হিজরী ১৩ সনে হযরত ওমর খলীফা হলেন। তিনিও হযরত তালহা (রাযি.)-কে যথোপযুক্ত মর্যাদা দিলেন এবং সর্বদা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে উপকৃত হলেন।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর আমলে

ইরাক বিজয়ের পর সেখানকার কৃষি জমি গনীমতের মালের মতো মুজাহিদদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করা হবে কি হবে না, এ প্রশ্নে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। একদল বললেন, ভাগ করাই উচিৎ হবে। কিন্তু খলীফাসহ অন্য একটি দল ছিলেন ভাগের বিরোধী। অতঃপর মজলিসে শুরার বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর খলীফার মতই সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। এ ব্যাপারে হযরত তালহা (রাযি.) শুরার বৈঠকে দ্ব্যর্থহীনভাবে খলীফার মতকে সমর্থন করে জোরালে বক্তব্য রাখেন।

আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর (রাযি.)-এর ওফাতের পূর্বে যে ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীর ওপর তাঁদের মধ্য থেকে যেকোনো একজনকে খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়ে যান তার মধ্যে হযরত তালহা (রাযি.)ও ছিলেন। কিন্তু তিনি আত্মত্যাগের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নিজে খিলাফাতের দাবি থেকে সরে দাঁড়ান এবং হযরত উসমান (রাযি.)-এর সমর্থনে নিজের ভোটটি প্রদান করেন।

হযরত উসমান (রাযি.)-এর আমলে

হযরত উসমান (রাযি.) বিদ্রোহীদের দ্বারা গৃহবন্দী হলেন। একদিন তিনি ঘরের জানালা দিয়ে মাথা বের করে বিদ্রোহী গ্রুপ ও মদীনার সমবেত লোকদের উদ্দেশ্য করে বক্তব্য রাখলেন। একপর্যায়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে কি তালহা আছেন? কেউ কোনো উত্তর দিল না। এভাবে যখন তিনি তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা করলেন, তখন হযরত তালহা (রাযি.) উঠে দাঁড়ালেন। হযরত উসমান (রাযি.) তাঁকে লক্ষ করে বললেন, এ জনতার মধ্যে আপনার উপস্থিতি এবং তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর সাড়া দেবেন, এমন আশা আমি করিনি।

আমি আপনাকে আল্লাহর নামে জিজ্ঞাসা করছি, একদিন অমুক স্থানে, যখন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে আমি ও আপনি ছাড়া আর কেউ ছিল না, রাসুলুল্লাহ (সা.) আপনাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'তালহা! প্রত্যেক নবীরই তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে জান্নাতে একজন সঙ্গী থাকবে। উসমান ইবনে আফফানই হবেন জান্নাতে আমার সঙ্গী। সেকথা আপনার স্মরণ আছে? হযরত তালহা (রাযি.) সায় দিলেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি জনতার ভেতর থেকে উঠে চলে গেলেন।

হযরত উসমান (রাযি.) শহীদ হলেন। মুসলিম উম্মাহর একটি অংশ হযরত উসমান (রাযি.)-এর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে কিসাস দাবি করলেন। হযরত তালহা (রাযি.) ও হযরত যুবাইর (রাযি.) মদীনা থেকে মক্কায় গিয়ে হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর সাথে মিলিত হলেন। বাসরার উপকণ্ঠেই তারা হযরত আলী (রাযি.)-এর সেনাবাহিনীর মুখোমুখী হলেন। হযরত কা'কা ইবনে আমর (রাযি.)-এর মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হলো। হযরত আলী (রাযি.), উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাযি.), হযরত তালহা (রাযি.) ও হযরত যুবাইর (রাযি.) সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছলেন।

উভয়পক্ষ তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেললো। কিন্তু চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রকারী ইহুদি ইবনে সাবার লোকেরা এতে প্রমাদ গুণলো। মূলত তারাই ছিল হযরত উসমান (রাযি.)-এর হত্যাকারী। তারা হযরত আলী (রাযি.)-এর সেনাবাহিনীর মধ্যে গা ঢাকা দিয়েছিল। রাতের অন্ধকারে তারা একদিকে হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর এবং অন্য দিকে হযরত আলী (রাযি.)-এর সেনাবাহিনীর ওপর তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। উভয়পক্ষের সৈন্যরা শান্তিচুক্তির সিদ্ধান্ত হওয়ায় নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছিল। অতর্কিত এ আক্রমণে ঘুম থেকে জেগে তারা মনে করলো প্রতিপক্ষ আক্রমণ শুরু করেছে। ইহুদি ইবনে সাবার চক্রান্ত সফল হলো। সকাল হতে না হতে তুমুল লড়াই বেঁধে গেল এবং ইতিহাসে এ লড়াই 'উটের যুদ্ধ' খাতে খ্যাত হলো। এ যুদ্ধে উভয় পক্ষের প্রায় দশ মতান্তরে তের হাজার লোক নিহত হলেন।

ওফাত

এ যুদ্ধের সূচনালগ্নেই সাবায়ীদের নিক্ষিপ্ত একটি তীর হযরত তালহা (রাযি.)-এর পায়ে বিঁধে। ক্ষত স্থান থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে না দেখে হযরত কা'কা ইবনে আমর (রাযি.) তাঁকে অনুরোধ করলেন বাসরার দারুল ইলাজে (হাসপাতাল) চলে যাওয়ার জন্য। তাঁরই অনুরোধে তিনি একটি চাকরকে সঙ্গে করে দারুল ইলাজে চলে যান। কিন্তু ইত্যবসরে তাঁর দেহ রক্তশূণ্য হয়ে পড়ে। সেখানে পৌঁছার কিছুক্ষণ পরেই তিনি ইনতিকাল করেন। বাসরাতেই তাঁকে দাফন করা হয়।

ইমাম ইবনে আসাকির (রহ.) বিভিন্ন সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, উটের যুদ্ধের দিন মারওয়ান ইবনুল হিকামের নিক্ষিপ্ত তীরে হযরত তালহা (রাযি.)

আহত হন। হিজরী ৩৬ সনের জামাদিউল আউয়াল মতান্তরে ১০ জামাদিউস সানী ৬৪ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন।

দানশীলতা

হযরত তালহা ছিলেন একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী। কিন্তু সম্পদ পুঞ্জিভূত করার লালসা তাঁর ছিল না। তাঁর দানশীলতার বহু কাহিনি ইতিহাসে পাওয়া যায়। ইতিহাসে তাঁকে 'দানশীল তালহা' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। একবার হাদরামাউত থেকে সত্তর হাজার দিরহাম তাঁর হাতে এলো। রাতে তিনি বিমর্ষ ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর কন্যা হযরত উম্মু কুলসুম (রাযি.) স্বামীর এ অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, আবু মুহাম্মদ, আপনার কী হয়েছে? মনে হয় আমার কোনো আচরণে আপনি কষ্ট পেয়েছেন।

না, একজন মুসলমান পুরুষের স্ত্রী হিসেবে তুমি বড় চমৎকার। কিন্তু সেই সন্ধ্যা থেকে আমি চিন্তা করছি, এত অর্থ ঘরে রেখে ঘুমালে একজন মানুষের তার পরওয়ারদিগারের প্রতি কিরূপ ধারণা হবে? এতে আপনার বিষন্ন ও চিন্তিত হওয়ার কি আছে? এত রাতে গরীব-দুঃখী ও আপনার আত্মীয় পরিজনদের কোথায় পাবেন? সকাল হলেই বণ্টন করে দেবেন। আল্লাহ তোমার ওপর রহম করুন! একেই বলে, বাপ কি বেটী।

পরদিন সকাল বেলা ভিন্ন ভিন্ন থলি ও পাত্রে সকল দিরহাম ভাগ করে মুহাজির ও আনসারদের গরীব মিসকীনদের মধ্যে তিনি বণ্টন করে দেন। তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে অপর একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এক ব্যক্তি হযরত তালহার নিকট এসে তাঁর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে কিছু সাহায্য চাইলো। হযরত তালহা (রাযি.) বললেন, অমুক স্থানে আমার একখণ্ড জমি আছে। হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাযি.) উক্ত জমির বিনিময়ে আমাকে তিন লাখ দিরহাম দিতে চান। তুমি ইচ্ছে করলে সেই জমিটুকু নিতে পার বা আমি তা বিক্রি করে তিন লাখ দিরহাম তোমাকে দিতে পারি। লোকটি মূল্যই নিতে চাইলো। তিনি তাঁকে বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ দান করেন। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্তদের মাঝে তিনিও একজন।

৭
হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.)

নাম-নসব ও বংশ

ইমাম বুখারী (রহ.)-এর মতে, জাহিলী যুগে আবদুর রহমান ইবনে আউফের নাম ছিল আবদু আমর। ইবনে সা'দ (রহ.) তাঁর *তাবাকাতে* উল্লেখ করেছেন, জাহিলী যুগে তাঁর নাম ছিল আবদুল কাবা। ইসলাম গ্রহণের পর রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর নাম রাখেন আবদুর রহমান।[১] তাঁর মাতা-পিতা উভয়ে ছিলেন 'যুহরা' গোত্রের লোক। মাতার নাম: শিফা বিনতু আউফ। দাদা ও নানা উভয়ের নাম: আউফ।

ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.) ওয়াকিদীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, তিনি আমুল ফীলের (হস্তীর বছর) দশ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। এ বর্ণনার ভিত্তিতে তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বয়সে দশ বছর ছোট।[২] রাসুলুল্লাহ (সা.) আমুল ফীলের ঘটনায় পঞ্চাশ দিন পর জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.) তাঁকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর তের বছর ছোট বলে উল্লেখ করেছেন।

ইসলাম গ্রহণ

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নুবুওয়াতপ্রাপ্তির পর প্রথম পর্যায়ে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি তাঁদেরই একজন। মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রায় প্রতিদিনই হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর বাড়িতে বৈঠকে মিলিত হতেন। হযরত আবদুর রহমান (রাযি.)ও ছিলেন এ বৈঠকের একজন নিয়মিত সদস্য।

[১] (ক) ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ১৯৬, হাদীস: ৩৫৭৫:

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ : كَانَ اسْمُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَبْدَ الْكَعْبَةِ ، فَسَمَّاهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ.

(খ) আল-হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন*, খ. ৩, পৃ. ৩৪৬, হাদীস: ৫৩৩২:

وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ اسْمُهُ: عَبْدُ عَمْرٍو، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ.

[২] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ১১৫, হাদীস: ৩১৬৯

হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর সাথে ছিল তাঁর গভীর বন্ধুত্ব। হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর দাওয়াতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।[১]

হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর বাড়ির এ বৈঠকের নিয়মিত পাঁচজন সদস্যের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। যেমন– হযরত উসমান (রাযি.), হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.), হযরত তালহা (রাযি.), হযরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.)। তাঁদের সকলেই হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর দাওয়াতে প্রথম পর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলামের জন্য অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ লাভ করেন।

হিজরত

নুবুওয়াতের পঞ্চম বছর রজব মাসে যে এগারজন পুরুষ ও চারজন নারীর প্রথম কাফিলাটি মক্কা থেকে হাবশায় হিজরত করে তার মধ্যে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.)ও ছিলেন। আবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মদীনায় হিজরতের পর তিনিও মদীনায় হিজরত করেন। যাঁরা হাবশা ও মদীনা দু'স্থানেই হিজরত করেছিলেন তাঁদেরকে বলা হয় সাহিবুল হিজরতাইন।

মুসলিম ভ্রাতৃত্ব

মদীনায় তিনি হযরত সা'দ ইবনুর রাবী আল-আনসারী আল-খাযরাজী (রাযি.)-এর ঘরে আশ্রয় নেন এবং তাঁর সাথেই রাসুলুল্লাহ (সা.) ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপন করে দেন। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহ.) একাধিক সনদের মাধ্যমে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে হযরত আনাস (রাযি.) বলেন, 'আবদুর রহমান ইবনে আউফ হিজরত করে মদীনায় এলে রাসুলুল্লাহ (সা.) সা'দ ইবনুর রাবীর সাথে তাঁর ভ্রাতৃসম্পর্ক কায়েম করে দেন।

হযরত সা'দ (রাযি.) ছিলেন মদীনার খাযরাজ গোত্রের নেতা ও ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি আবদুর রহমানকে বললেন, 'আনসারদের সকলে জানে আমি একজন ধনী ব্যক্তি। আমি আমার সকল সম্পদ সমান দু'ভাগে ভাগ করে দিতে চাই। আমার দু'জন স্ত্রী আছেন। আমি চাই, আপনি তাদের দু'জনকে

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ১১৫, হাদীস: ৩১৭০

দেখে একজনকে পছন্দ করুন। আমি তাকে তালাক দেব। তারপর আপনি তাকে বিয়ে করে নেবেন।' আবদুর রহমান বললেন, 'আল্লাহ আপনার পরিজনের মধ্যে বরকত ও কল্যাণ দান করুন! ভাই, এসব কোনো কিছুর প্রয়োজন আমার নেই। আমাকে শুধু বাজারের পথটি দেখিয়ে দিন।'

ইসলামি ভ্রাতৃত্বে হযরত সা'দ (রাযি.)-এর এ দৃঢ় আস্থা ও অতুলনীয় উদারতার দৃষ্টান্ত মুসলিম উম্মাহ তথা মানবজাতির ইতিহাসে বিরল। অন্যদিকে হযরত আবদুর রহমান (রাযি.)-এর মহত্ব, আত্মনির্ভরতা ও নিজ পায়ে দাঁড়ানোর দৃঢ় সংকল্পও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

মদীনায় অবস্থানের দ্বিতীয় দিন আবদুর রহমান (রাযি.) তাঁর আনসারী ভাই সা'দ (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেচাকেনা হয় এমন কোনো বাজার কি এখানে আছে?' বললেন, 'হ্যাঁ, ইয়াসরিবে (মদীনায়) কায়নুকার বাজার তো আছে।' হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) এক স্থান থেকে কিছু ঘি ও পনির খরিদ করে বাজারে যান। দ্বিতীয় দিনও তিনি এমনটি করলেন। এভাবে তিনি বেচাকেনা জারি রাখেন। কিছু পয়সা হাতে জমা হলে তিনি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেন।

বিয়ের পর তিনি একদিন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে হাজির হলেন। তাঁর কাপড়ে হলুদের দাগ দেখে রাসুলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি বিয়ে করেছ?' বললেন, 'হ্যাঁ'। জিজ্ঞাসা করলেন কাকে?' তিনি বললেন, 'এক আনসারী মহিলাকে।' রাসুলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'মোহর কত নির্ধারণ করেছ?' তিনি বললেন, 'কিছু সোনা।' অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'একটি ছাগল দিয়ে হলেও ওয়ালিমা করে নাও।'

তিনি ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকলেন। কিছুদিন পর তার হাতে আরও কিছু অর্থ জমা হলে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশমত ওয়ালিমার কাজটি সেরে নেন। ধীরে ধীরে তাঁর ব্যবসা আরও সম্প্রসারিত হয়। মক্কার উমাইয়া ইবনে খালফের সাথে একটি ব্যবসায়িক চুক্তিও সম্পাদন করেন।

যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.) বদর, উহুদ ও খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন এবং অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দেন। ইমাম বুখারী (রহ.) কিতাবুল মাগাযীতে বদর যুদ্ধের একটি ঘটনা তাঁরই যবানে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

إِنِّيْ لَفِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ إِذِ التَفَتُّ فَإِذَا عَنْ يَمِيْنِيْ وَعَنْ يَسَارِيْ فَتَيَانِ حَدِيْثَا السِّنِّ، فَكَأَنِّيْ لَمْ آمَنْ بِمَكَانِهِمَا، إِذْ قَالَ لِيْ أَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ: يَا عَمِّ أَرِنِيْ أَبَا جَهْلٍ، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ أَخِيْ، وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: عَاهَدْتُ اللهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ أَوْ أَمُوْتَ دُوْنَهُ، فَقَالَ لِي الْآخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ، قَالَ: فَمَا سَرَّنِيْ أَنِّيْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا، فَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ، فَشَدَّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ حَتَّىٰ ضَرَبَاهُ، وَهُمَا ابْنَا عَفْرَاءَ.

'বদর যুদ্ধে, আমি সারিতে দাঁড়িয়ে। তুমুল লড়াই চলছে। আমি ডানে বাঁয়ে তাকিয়ে আমার দু'পাশে দুই নওজোয়ানকে দেখলাম। তাদের ওপর আমার খুব একটা আস্থা হলো না। তাদের একজন ফিসফিস করে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, 'চাচা, বলুন তো আবু জাহল কোনো দিকে?' বললাম, 'ভাতিজা, তাকে দিয়ে কি করবে?' সে বলল, 'আমি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছি, হয় আমি তাকে কতল করবো, না হয় এ উদ্দেশ্যে আমার নিজের জীবন কুরবান করবো।' একই কথা ফিসফিস করে আমাকে বলল অন্যজনও। হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) বলেন, 'তাদের কথা শোনার পর আমার আনন্দ হলো এই ভেবে যে, কত মহান দু'ব্যক্তির মাঝখানেই না আমি দাঁড়িয়ে। আমি ইশারা করে আবু জাহলকে দেখিয়ে দিলাম। অকস্মাৎ তারা দু'জন একসাথে বাজপাখীর মতো আবু জাহলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুহূর্তের মধ্যেই তাকে কতল করে। এ দু'নওজোয়ান ছিল আফরার দু'পুত্র মুয়ায ও মু'য়াওবিয।''[১]

বদর যুদ্ধে হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) পায়ে আঘাত পান। উহুদের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধেও তিনি অসম সাহসিকতা প্রদর্শন করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) উহুদ পর্বতের এক কোণে আশ্রয় নিয়েছেন, উবাই ইবনে খালফ এগিয়ে এলো আল্লাহর রাসুল (রাযি.)-কে শহীদ করার উদ্দেশ্যে। হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) তাকে জাহান্নামে পাঠানোর উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বাধা দেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ৭৮, হাদীস: ৩৯৮৮

(সা.) নিজেই হারিস ইবনে সাম্মার নিকট থেকে বর্শা নিয়ে উবাই ইবনে খালফের গর্দানে ছুড়ে মারেন। সামান্য আহত হয়ে সে চেঁচাতে চেঁচাতে পালিয়ে যায় এবং মক্কার পথে সারফ নামক স্থানে নরক যাত্রা করে।

ইবন সা'দ (রহ.) *আত-তাবাকাতুল কুবরা* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, উহুদের যুদ্ধে হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) অসীম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেন।[১] ইমাম আহমদ আল-বালাযুরী (রহ.) তাঁর *ফুতুহুল বুলদান*, হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.) তাঁর *আল-ইসাবা* এবং ইবনে খালদুন (রহ.) তাঁর তারীখে বর্ণনা করেছেন, এ যুদ্ধে তিনি সারা দেহে মোট একত্রিশটি আঘাত পান।[২]

ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে রাসুলুল্লাহ (সা.) মদীনা থেকে প্রায় তিনশো মাইল উত্তরে দুমাতুল জান্দালে একটি অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব দেন হযরত আবদুর রহমান (রাযি.)-কে। যাত্রার পূর্বে তিনি উপস্থিত হলেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজ হাতে হযরত আবদুর রহমান (রাযি.)-এর মাথার পাগড়িটা খুলে রেখে দিয়ে অন্য একটি কালো পাগড়ি তার মাথায় বেঁধে দেন। তারপর যুদ্ধের পলিসি সংক্রান্ত কিছু হিদায়ত দিয়ে তিনি হযরত আবদুর রহমান (রাযি.)-কে বিদায় দেন।[৩]

মক্কা বিজয়ের সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) মুহাজিরদের যে ছোট্ট দলটির সঙ্গে ছিলেন হযরত আবদুর রহমান (রাযি.)ও ছিলেন সেই দলে। মক্কা বিজয়ের পর রাসুলুল্লাহ (সা.) আরব উপদ্বীপে দাওয়াতী কাজের জন্য কতকগুলো তাবলীগী গ্রুপ বিভিন্ন দিকে পাঠান। তখনও আরব গোত্রগুলো মূর্খতা ও আসাবিয়াতের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এ কারণে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাবলীগী গ্রুপগুলোকে সশস্ত্র অবস্থায় পাঠলেন। যাতে প্রয়োজনে তারা আত্মরক্ষা করতে পারে।

এরকম তিরিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি দলকে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.)-এর নেতৃত্বে বনি খুযায়মার লোকদের নিকট পাঠানো হলো। কিন্তু হযরত খালিদ (রাযি.) ও বনি খুযায়মার মধ্যে ভুল বুঝা-বুঝি সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে হযরত খালিদ (রাযি.) বনি খুযায়মার ওপর হামলা করে তাদের

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ১১৯, হাদীস: ৩১৮৩
[২] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ৪, পৃ. ২৯২, ক্র. ৫১৯৫
[৩] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ১২০, হাদীস: ৩১৮৫

বহু লোককে হতাহত করেন। এ ঘটনা অবগত হয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত খালিদ (রাযি.)-কে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং তঁর ভুলের জন্য আল্লাহর নিকট মাগফিরাত কামনা করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) নিহত ব্যক্তিদের দিয়াত আদায় করেন। এমনকি কারও একটি কুকুরও মারা গিয়ে থাকলে তারও বিনিময় মূল্য আদায় করা হয়।

বনু খুযায়মার এ দুর্ঘটনা নিয়ে হযরত খালিদ (রাযি.) ও হযরত আবদুর রহমান (রাযি.)-এর মধ্যে বচসা ও বিতর্ক হয়। একথা রাসুলুল্লাহ (সা.) অবগত হয়ে খালিদকে ডেকে তিরস্কার করেন। তিনি বলেন, 'তুমি সাবিকীনে আউওয়ালীন' (প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারী) একজন সাহাবীর সাথে ঝগড়া ও তর্ক করেছ। এমনটি করা তোমার শোভন হয়নি। আল্লাহর কসম, যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনার মালিকও তুমি হও এবং তার সবই আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দাও, তবুও তুমি আমার সেসব প্রবীণ সাহাবীর একজনেরও সমকক্ষ হতে পারবে না।' উল্লেখ থাকে যে, হযরত খালিদ (রাযি.) আহযাবের যুদ্ধের পর ষষ্ঠ হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

আল্লাহর রাস্তায় দান

নবম হিজরীতে তাবুক অভিযানের সময় মুসলমানগণ যে ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হয় সে পরীক্ষায়ও তিনি কৃতকার্য হন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আবেদনে সাড়া দিয়ে এ অভিযানের জন্য হযরত আবু বকর (রাযি.), হযরত উসমান (রাযি.) ও হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) রেকর্ড পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন। হযরত আবদুর রহমান আট হাজার দিনার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে তুলে দিলে মুনাফিকরা কানাঘুষা শুরু করে দেয়। তারা বলতে থাকে, 'সে একজন রিয়াকার, লোক দেখানোই তার উদ্দেশ্য।' তাদের জবাবে আল্লাহ বলেন,

أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ

'এ তো সেই ব্যক্তি যার ওপর আল্লাহর রহমত নাযিল হতে থাকবে।'[১]

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর এ দান দেখে বলে ফেলেন, 'আমার মনে হচ্ছে আবদুর রহমান গুনাহগার হয়ে যাচ্ছে। কারণ সে

[১] আল-কুরআন, *সুরা আত-তাওবা*, ৯:৭১

তার পরিবারের লোকদের জন্য কিছুই রাখেনি।' একথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, 'আবদুর রহমান! পরিবারের জন্য কিছু রেখেছ কি?' তিনি বলেন, 'হ্যাঁ। আমি যা দান করেছি তার থেকেও বেশি ও উৎকৃষ্ট জিনিস তাদের জন্য রেখেছি।' রাসুলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত?' বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যে রিযিক, কল্যাণ ও প্রতিদানের অঙ্গীকার করেছেন, তাই।'

নববী যুগে ইমামতি

তাবুক অভিযানকালে একদিন ফজরের নামাযের সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে যান। ফিরতে একটু দেরি হয়। এদিকে নামাযের সময়ও হয়ে যায়। তখন সমবেত মুসল্লীদের অনুরোধে হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) ইমাম হিসেবে নামাযে দাঁড়িয়ে যান। এদিকে রাসুলুল্লাহ (সা.) ফিরে এলেন, এক রাকায়াত তখন শেষ। হযরত আবদুর রহমান রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর উপস্থিতি অনুভব করে পেছন দিকে সরে আসার চেষ্টা করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে নিজের স্থানে থাকার জন্য হাত ইশারা করেন। অতঃপর অবশিষ্ট দ্বিতীয় রাকায়াতটিও তিনি শেষ করেন এবং রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর পেছনে ইকতিদা করেন। ইমাম মুসলিম (রহ.) ও ইমাম আবু দাউদ (রহ.) তাঁদের সহীহ গ্রন্থদ্বয়ে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর যুগে

প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাযি.) অন্তিম রোগশয্যায়। জীবনের আশা আর নেই। তাঁর পর খলীফা কে হবেন সে সম্পর্কে চিন্তাশীল বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরামের ডেকে পরামর্শ করলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাযি.)-এর সাথেও পরামর্শ করেন এবং হযরত ওমর (রাযি.)-এর কিছু গুণাবলি তুলে ধরে পরবর্তী খলীফা হিসেবে তাঁর নামটি তিনি প্রস্তাব করেন। হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) ধৈর্য সহকারে খলীফার কথা শোনার পর বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। তবে স্বভাবগতভাবেই তিনি একটু কঠোর।'

হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর খিলাফতকালে আটজন বিশিষ্ট সাহাবীকে ফাতওয়া ও বিচারের দায়িত্ব প্রদানের সাথে সাথে অন্য সকলকে ফাতওয়া

দান থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) ছিলেন এ আটজনের একজন।

হযরত ওমর (রাযি.)-এর যুগে

হযরত ওমর (রাযি.)ও তাঁর খিলাফতকালে জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অধিকারী সাহাবায়ে কেরামের ছাড়া অন্য সকলকে বিচার কাজ থেকে বিরত রাখেন। এমনকি যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-কে তিনি খাযিনাতুল ইলম (জ্ঞানের ভাণ্ডার) বলে অভিহিত করতেন, তিনিও যখন পূর্ব অনুমতি ছাড়াই ফাতওয়া দিতে শুরু করেন, তাঁকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়। জ্ঞানের যে শাখায় যিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন হযরত ওমর (রাযি.) তাকে কেবল সে বিষয়েই মতামত প্রকাশের অনুমতি প্রদান করেন।

এ সম্পর্কে সিরিয়া সফরকালে জাবিয়া নামক স্থানে এক বক্তৃতায় বলেন, 'যারা কুরআন বুঝতে চায় তারা উবাই ইবনে কা'ব, যারা ফারায়েয সম্পর্কে জানতে চায় তারা যায়েদ ইবনে সাবিত এবং যারা ফিকহ সংক্রান্ত বিষয়ে অবগত হতে চায় তারা মুআয ইবনে জাবাল ও আবদুর রহমান ইবনে আউফের সাথে যেন সম্পর্ক গড়ে তোলে।'

খলীফা হযরত ওমর (রাযি.) হযরত আবদুর রহমান (রাযি.)-কে বিশেষ উপদেষ্টার মর্যাদা দেন। রাতে তিনি যখন ঘুরে ঘুরে নগরের মানুষের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতেন, অনেক সময় সঙ্গে নিতেন হযরত আবদুর রহমান (রাযি.)-কে এবং নানা বিষয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করতেন।

একদিন রাতে খলীফা ওমর (রাযি.) বের হলেন আবদুর রহমান (রাযি.)-কে সঙ্গে নিয়ে নগর পরিভ্রমণে। দূর থেকে তাঁরা লক্ষ করলেন একটি বাড়িতে আলো। কাছে গিয়ে দেখলেন বাড়ির দরজা-জানালা সব বন্ধ; কিন্তু ভেতর থেকে কিছু লোকের উচ্চকণ্ঠ ভেসে আসছে। খলীফা ওমর (রাযি.) আবদুর রহমান (রাযি.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ভেতর থেকে আসা আওয়ায শুনতে পাচ্ছেন?

জী হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। কি বলছে, তা কি বুঝতে পারছেন? 'সমবেত কণ্ঠের আওয়ায। কেবল শোরগোল শোনা যাচ্ছে। কি বলছে তা বোঝা যাচ্ছে না। আপনি কি জানেন বাড়িটি কার? বাড়িটি তো রাবীয়া ইবনে উমাইয়ার। হযরত ওমর (রাযি.) বলেন, সম্ভবত তারা মদপান করে মাতলামি করছে।

আপনার কি মনে হয়? আল্লাহ আমাদেরকে গুপ্তচরবৃত্তি থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

وَلَا تَجَسَّسُوا

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

'গুপ্তচর বৃত্তি করো না।'[১] 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার অনুসরণ করো না।'[২]

একথা শুনে হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন এবং যথাসময়ে স্মরণ করে দিয়েছেন।' এই বলে তিনি আবদুর রহমান (রাযি.)-কে সঙ্গে নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) এ ক্ষেত্রে যে আয়াত দুটি আমীরুল মুমিনীনকে স্মরণ করে দেন, তা হচ্ছে মুসলিম সমাজ জীবনে ব্যক্তির বুনিয়াদি অধিকারের প্রাণস্বরূপ।

১৬ হিজরী সনে ইরাক বিজয়ের ফলে ইরাকে কিসরা শাহানশাহীর পতন হয় এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর সিরিয়া থেকে রোমের কাইসার সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। খলীফা জিযিয়া ও খারাজ নির্ধারণের ব্যাপারে উদ্যোগী হন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাযি.), হযরত বিলাল (রাযি.) ও হযরত আবদুর রহমান (রাযি.)-এর প্রবল প্রতিবাদের সম্মুখীন হন। অবশেষে মজলিসে শুরার ক্রমাগত বৈঠকে দীর্ঘ আলোচনার পর খলীফার মতামতই গৃহীত হয়।

খলীফা হযরত ওমর (রাযি.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবায়ে কেরামের ভাতা নির্ধারণের ইচ্ছা করলেন। এ ইচ্ছা তিনি ব্যক্ত করলেন হযরত আবদুর রহমান (রাযি.)-এর নিকট। তিনি পরামর্শ দিলেন, কুষ্ঠি বিদ্যায় পারদর্শী তিন ব্যক্তি হযরত মাখযামা ইবনে নাওফিল (রাযি.), হযরত খায়বর ইবনে মাতআম (রাযি.) ও হযরত আকীল ইবনে আবু তালিব (রাযি.)-এর ওপর একটি তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণের জন্য। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী খলীফা তাঁদেরকে দায়িত্ব প্রদান করলেন। তাঁরা তালিকা প্রণয়ন করে খলীফার নিকট পেশ করতে আমীরুল মুমিনীন ও হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) দু'জনেই তা পরীক্ষা করেন।

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-হুজুরাত*, ৪৯:১২
[২] আল-কুরআন, *সুরা আল-ইসরা*, ১৭:৩৭

হযরত ওমর (রাযি.) তালিকা দেখার পর বললেন, 'বর্তমান তালিকার ক্রমধারা পরিবর্তন করে আমার নিজের ও আমার গোত্রীয় অন্য লোকদের নাম রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বংশগত সম্পর্কের দিক দিয়ে যখন আসবে তখন লিখবে।' হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) আপত্তি করে বললেন, 'আপনি আমীরুল মুমিনীন। তালিকার সূচনা আপনার নাম দিয়েই হওয়া উচিৎ।' তিনি বললেন, 'না। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর চাচা আব্বাস (রাযি.) থেকে শুরু কর, তারপর আলীর নামটি লিখ।' ভাতার পরিমাণ তিনি আবদুর রহমান (রাযি.)-এর সাথে পরামর্শ করেই নির্ধারণ করেন। তারপর তা মজলিসে শুরায় পেশ করেন।

আযওয়াজে মুতাহহারাত (রাসুলুল্লাহ সা.-এর সহধর্মিণীগণ) বেশ আগে থেকেই হজ পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করছিলেন। ২৩ হিজরী সনে খলীফা ওমর (রাযি.) তাঁদের হজ আদায়ের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেন। তিনি নিজেও তাঁদের সফরসঙ্গী হন। তাঁদের সফর ব্যবস্থাপনার যাবতীয় দায়িত্ব হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) ও হযরত উসমান (রাযি.)-এর ওপর অর্পণ করেন। সফরের সময় হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) কাফিলার আগে এবং হযরত উসমান (রাযি.) পেছনে সশস্ত্র অবস্থায় পাহারা দিয়ে চলতেন। কোনো ব্যক্তিকে তাঁদের উটের কাছে ঘেঁষতে দিতেন না। তাঁরা যখন কোথাও অবস্থান করতেন, এরা দু'জন তাঁবুর প্রহরায় নিয়োজিত থাকতেন।

হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর খিলাফতের প্রথম বছর আবদুর রহমান (রাযি.)-কে আমীরে হজ নিয়োগ করে মক্কায় পাঠান। আর তাঁর সাথে পাঠান নিজের পক্ষ থেকে কুরবানির একটি পশু। এ বছর বিশ্ব মুসলিম তাঁর নেতৃত্বেই হজ আদায় করে।

খলীফা হযরত ওমর (রাযি.) ফজরের জামায়াতে ইমামতি করছিলেন। মুগীরা ইবনে শু'বার পারসিক দাস ফিরোয তাকে ছুরিকাঘাত করে। আহত অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি পেছনে দণ্ডায়মান হযরত আবদুর রহমান (রাযি.)-এর হাতটি ধরে নিজের স্থানে তাঁকে দাঁড় করে দেন এবং তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। অতপর হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) অবশিষ্ট নামায দ্রুত শেষ করেন।

হযরত ওমর (রাযি.) আহত হওয়ার দশ ঘণ্টা পর সমবেত লোকদের বললেন, 'আপনারা যেমন বলতেন আমিও চাচ্ছিলাম, এ উম্মতের বোঝা

বহনের ক্ষমতা রাখে এমন এক ব্যক্তিকে আমি আমীর বানিয়ে যাই। পরে আমি চিন্তা করলাম, এমনটি করলে আমার মৃত্যুর পরও এর দায়-দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাবে। এ কারণে আমার সাহস হলো না। এ ছয় ব্যক্তি হযরত আলী (রাযি.), হযরত উসমান (রাযি.), হযরত আবদুর রহমান (রাযি.), হযরত সা'দ (রাযি.), হযরত যুবাইর (রাযি.) ও হযরত তালহা (রাযি.)। আল্লাহর রাসুল (সা.) তাঁদেরকে জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। তাঁদের কোনো একজনকে আপনারা আমীর নির্বাচন করে নেবেন।

এ ছয়জন ছাড়া আমার পুত্র আবদুল্লাহও আছে। তবে খিলাফতের সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। উল্লেখিত ছয় ব্যক্তি যদি খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে তিনজন করে সমান দু'দলে বিভক্ত হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ যে দলকে সমর্থন করবে সে দল থেকেই খলীফা হবে। কিন্তু আবদুল্লাহর মতামত যদি সর্বসাধারণের নিকট গৃহীত না হয় তাহলে আবদুর রহমান যে দলে থাকবেন তাঁদের মতই গ্রহণযোগ্য হবে।' হযরত ওমর (রাযি.)-এর এ পরামর্শের মধ্যে আবদুর রহমান (রাযি.) সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

হযরত ওমর (রাযি.) ইনতিকাল করলেন। হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) খলীফা হতে রাজি ছিলেন না। এদিকে হযরত তালহা (রাযি.)ও তখন মদীনায় ছিলেন না। অবশিষ্ট চার ব্যক্তি খলীফা নির্বাচনের পূর্ণ দায়িত্ব আবদুর রহমান (রাযি.)-এর ওপর ন্যস্ত করেন।

হযরত আবদুর রহমান (রাযি.)-এর ওপর অর্পিত এ দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আমানতদারির সাথে পালন করেন। ক্রমাগত তিন দিন তিন রাত বিভিন্ন স্তরের লোকদের সাথে মতবিনিময় করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হযরত উসমান (রাযি.)-এর পক্ষেই মত ব্যক্ত করেন। অবশেষে হযরত ওমর (রাযি.)-এর নির্ধারিত সময় তিন দিন তিন রাত শেষ হওয়ার আগে তিনি মানুষকে ফজরের জামায়াতে শরীক হওয়ার জন্য আবেদন জানান। নামায শেষে তিনি সমবেত জনমণ্ডলীর সামনে খলীফা হিসেবে হযরত উসমান (রাযি.)-এর নামটি ঘোষণা করেন। হযরত ওমর (রাযি.)-এর ছুরিকাহত হওয়ার পর থেকে তাঁরই নির্দেশে তৃতীয় খলীফা হিসেবে হযরত উসমান (রাযি.)-এর নাম ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি জামায়াতের ইমামতি করেন এবং প্রশাসনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেন।

হযরত উসমান (রাযি.)-এর যুগে

চব্বিশ হিজরী সনের মুহাররম মাসে হযরত উসমান (রাযি.) খলীফা নির্বাচিত হন। সে বছরই তিনি হযরত আবদুর রহমান (রাযি.)-কে আমীরুল হজ নিযুক্ত করেন। মুসলিম উম্মাহ সে বছরের হজটি তাঁরই নেতৃত্বে আদায় করে।

হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) আমরণ খলীফা উসমান (রাযি.)-এর মজলিসে শুরার সদস্য থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দানের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর বিশেষ খেদমত আঞ্জাম দেন। হযরত আবু বকর (রাযি.), হযরত ওমর (রাযি.) ও হযরত উসমান (রাযি.) এ তিন খলীফার প্রত্যেকের নিকটই তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ও আস্থার পাত্র।

ওফাত

ইবন সা'দ (রহ.)-এর মতে, হযরত আবদুর রহমান হিজরী ৩২ সালে ৭৫ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন। তবে হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.)-এর মতে, তিনি ৭২ বছর জীবন লাভ করেছিলেন। হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.) একথাও বলেছেন, হযরত উসমান (রাযি.) অথবা যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাযি.) তাঁর জানাযার ইমামতি করেন এবং তাঁকে মদীনার বাকী' গোরস্থানে দাফন করা হয়। গোরস্থান পর্যন্ত তার লাশ বহনকারীদের মধ্যে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.)ও ছিলেন।

ব্যবসা-বাণিজ্য

পূর্বেই আমরা দেখেছি সম্পূর্ণ রিক্ত হস্তে হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) মদীনায় এসেছিলেন। সামান্য ঘি ও পনির কেনাবেচার মাধ্যমে তিনি তাঁর ব্যবসা শুরু করেন। কালক্রমে তিনি তৎকালীন মুসলিম উম্মাহর একজন সেরা ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিতে পরিণত হন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দুআ করেছিলেন এবং সে দুআ আল্লাহর দরবারে কবুলও হয়েছিল। কিন্তু সে সম্পদের প্রতি তাঁর একটুও লোভ ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ইনতিকালের পরেও আমরণ তিনি সে সম্পদ অকৃপণ হাতে আল্লাহর পথে ও মানব কল্যাণে ব্যয় করেছেন।

দানশীলতা

একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) একটি অভিযানের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বলেন, 'আমি একটি অভিযানে সৈন্য পাঠানোর ইচ্ছা করেছি, তোমরা সাহায্য কর।' হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) এসে দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে আবার ফিরে এসে বললেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমার কাছে এ চার হাজার আছে। দু'হাজার আমার রবকে করজে হাসানা দিলাম এবং বাকী দু'হাজার আমার পরিবার-পরিজনদের জন্য রেখে দিলাম।' রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'তুমি যা দান করেছ এবং যা রেখে দিয়েছ, তার সবকিছুতে আল্লাহ তাআলা বরকত দান করুন।'

একবার মদীনায় শোরগোল পড়ে গেল, সিরিয়া থেকে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য নিয়ে একটি বাণিজ্য কাফিলা উপস্থিত হয়েছে। শুধু উট আর উট। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাযি.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ কার বাণিজ্য কাফিলা?' লোকেরা বলল, 'আবদুর রহমান ইবনে আউফের।' তিনি বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আমি যেন আবদুর রহমানকে সিরাতের ওপর একবার হেলে গিয়ে আবার সোজা হয়ে উঠতে দেখলাম।' অন্য একটি বর্ণনায় আছে, হযরত আয়িশা (রাযি.) বলেন, 'আল্লাহ দুনিয়াতে তাকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে বরকত দিন এবং তাঁর আখিরাতের প্রতিদান এর থেকেও বড়। আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আবদুর রহমান হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর একথাগুলো হযরত আবদুর রহমান (রাযি.)-এর কানে গেল। তিনি বললেন, 'ইনশাআল্লাহ আমাকে সোজা হয়েই জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে।' অতঃপর তিনি তাঁর সকল বাণিজ্য সম্ভার সাদকা করে দেন। পাঁচশত, মতান্তরে সাতশত উটের পিঠে এ মালামাল বোঝাই ছিল। কেউ বলেছেন, বাণিজ্য সম্ভারের সাথে উটগুলোও তিনি সাদকা করে দেন।[১]

হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) ছিলেন উম্মাহাতুল মুমিনীনের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। তাঁদের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি আজীবন অকাতরে খরচ করেছেন। তাঁদের নিকট তিনি ছিলেন একজন বিশ্বাসী ও আস্থাভাজন ব্যক্তি। একবার তিনি কিছু ভূমি চল্লিশ হাজার দীনারে বিক্রি করেন এবং

[১] ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, খ. ৩, পৃ. ৪৭৫, ক্রমিক: ৩৩৭০

বিক্রয়লব্ধ সমুদয় অর্থ বনি যুহরা (রাসুলুল্লাহ সা.-এর জননী হযরত আমিনার পিতৃ-গোত্র), মুসলমান, ফকীর মিসকীন, মুহাজির ও আযওয়াজে মুতাহহারাতের মধ্যে বণ্টন করে দেন। হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর নিকট তাঁর অংশ পৌঁছলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে পাঠিয়েছে?' বলা হলো, 'আবদুর রহমান ইবনে আওফ।' তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'আমার পরে ধৈর্যশীলরাই তোমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবে।'[১]

হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.) *আল-ইসাবা* গ্রন্থে জা'ফর ইবনে বারকানের সূত্রে উল্লেখ করেছেন, আবদুর রহমান মোট তিরিশ হাজার দাস মুক্ত করেছেন। জাহিলী যুগেও মদ পানকে তিনি হারাম মনে করতেন।[২]

তাকওয়া-পরহেযগারি

হযরত আবদুর রহমান (রহ.) ছিলেন তাকওয়া ও আল্লাহভীতির এক বাস্তব নমুনা। মক্কায় গেলে তিনি তাঁর আগের বাড়ি-ঘরের দিকে ফিরেও তাকাতেন না। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনার বাড়ি-ঘরের প্রতি আপনি এত নাখোশ কেন?' তিনি বললে, 'ওগুলো তো আমি আমার আল্লাহর জন্য ছেড়ে দিয়েছি।'

একবার তিনি তাঁর বন্ধুদের দাওয়াত দিলেন। ভালো ভালো খাবার এলো। খাবার দেখে তিনি কান্না শুরু করে দিলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, 'কি হয়েছে?' তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) বিদায় নিয়েছেন। তিনি নিজের ঘরে যবের রুটিও পেট ভরে খেতে পাননি।'

একদিন তিনি সাওম পালন করছিলেন। ইফতারের পর তাঁর সামনে আনীত খাবারের দিকে তাকিয়ে বলরেন, 'মুসয়াব ইবনে উমায়ের ছিলেন আমার থেকেও উত্তম মানুষ। তিনি শহীদ হলে তাঁর জন্য মাত্র ছোট্ট একখানা কাফনের কাপড় পাওয়া গিয়েছিল। তা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা এবং পা ঢাকলে মাথা বেরিয়ে যাচ্ছিল। তারপর আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য দুনিয়ার এ প্রাচুর্য দান করলেন। আমার ভয় হয়, আমাদের বদলা না জানি দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়।' অতঃপর তিনি হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন।

[১] ইবনুল আসীর, *উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা*, খ. ৩, পৃ. ৪৭৫, ক্রমিক: ৩৩৭০
[২] ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা*, খ. ৪, পৃ. ২৯৩, ক্র. ৫১৯৬

ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা

হযরত ওমর (রাযি.) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'আবদুর রহমান মুসলিম নেতৃবৃন্দের একজন।' হযরত আলী (রাযি.) একটি ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, 'আবদুর রহমান আসমান ও জমিনের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি।'

হযরত আবদুর রহমান (রাযি.) রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে সরাসরি ও হযরত ওমর (রাযি.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর থেকে তাঁর পুত্রগণ, যেমন– ইবরাহীম, হুমায়েদ, ওমর, মুসয়াব, আবু সালামা, তাঁর পৌত্র মিসওয়ার, ভাগ্নে মিসওয়ার ইবনে মাখরামা এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.), হযরত যুবাইর (রায.), হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.), হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাযি.) ও হযরত মালিক ইবনে আওস (রাযি.) প্রমুখ সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর বড় পরিচয়, তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারার একজন।

৮

হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.)

নাম-নসব ও বংশ

নাম: আবু ইসহাক সা'দ, পিতা আবু ওয়াক্কাস মালিক। ইতিহাসে তিনি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস নামে খ্যাত। কুরাইশ বংশের বনি যুহরা শাখার সন্তান। মাতার নাম: হামনা। পিতা-মাতা উভয়েই ছিলেন কুরাইশ বংশের।

ইসলাম গ্রহণ

হযরত সা'দ (রাযি.)-এর পিতা হযরত আবু ওয়াক্কাস (রাযি.) ইসলাম গ্রহণ করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। তাঁর অন্তিম রোগশয্যায় রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। মাতা হামনাও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তবে প্রথমত তাঁর পুত্র হযরত সা'দ (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের কথা শুনে হৈ চৈ ও বিলাপ শুরু করে লোকজন জড়ো করে ফেললেন।

মায়ের কাণ্ড দেখে ক্ষোভে দুঃখে হতভম্ব হয়ে হযরত সা'দ (রাযি.) ঘরের এক কোণে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেন। কিছুক্ষণ বিলাপ ও হৈ চৈ করার পর মা পরিষ্কার বলে দিলেন, 'সা'দ যতক্ষণ মুহাম্মদের রিসালাতের অস্বীকৃতির ঘোষণা না দেবে ততক্ষণ আমি কিছু খাব না, কিছু পান করব না, রৌদ্র থেকে বাঁচার জন্য ছায়াতেও আসব না। মার আনুগত্যের হুকুম তো আল্লাহও দিয়েছেন। আমার কথা না শুনলে অবাধ্য বলে বিবেচিত হবে এবং মার সাথে তার কোনো সম্পর্কও থাকবে না।'

হযরত সা'দ (রাযি.) বড় অস্থির হয়ে পড়লেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে সব ঘটনা বিবৃত করলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে জবাব পাওয়ার পূর্বেই সুরা আল-আনকবুতের অষ্টম আয়াতটি নাযিল হয়:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ

'আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তবে তারা যদি তোমার ওপর বল প্রয়োগ করে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে বলে যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদের মেনো না।'[১]

কুরআনের এ আয়াতটি হযরত সা'দ (রাযি.)-এর মানসিক অস্থিরতা দূর করে দিল। তাঁর মা তিনদিন পর্যন্ত কিছু মুখে দিলেন না, কারো সাথে কথা বললেন না এবং রোদ থেকে ছায়াতেও এলেন না। তাঁর অবস্থা বড় শোচনীয় হয়ে পড়ল। বারবার তিনি মার কাছে এসে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর একই কথা, তাঁকে ইসলাম ত্যাগ করতে হবে।

অবশেষে তিনি মার মুখের ওপর বলে দিতে বাধ্য হলেন, 'মা, আপনার মতো হাজারটি মাও যদি আমার ইসলাম ত্যাগ করার ব্যাপারে জিদ করে পানাহার ছেড়ে দেয় এবং প্রাণ বিসর্জন দেয়, তবুও সত্য দীন পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' হযরত সা'দ (রাযি.)-এর এ চরম সত্য কথাটি তাঁর মার অন্তরে দাগ কাটে। অবশেষে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম মুসলিম তাঁর *সহীহ* গ্রন্থে ফাযায়িল অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন।[২]

হযরত সা'দ (রাযি.)-এর ভাই হযরত উমাইর (রাযি.) রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নুবুওয়াতপ্রাপ্তির কিছুদিন পরই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন প্রথম পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। ইমাম ইবনে খালদুন (রহ.) তাঁর তারীখে হযরত উমাইর (রাযি.)-এর পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩]

হযরত আবু বকর (রাযি.) ছিলেন হযরত সা'দ (রাযি.)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু। হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর দাওয়াতেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম বুখারী (রহ.) তাঁর *সহীহ* গ্রন্থে মানাকিব অধ্যায়ে হযরত সাদ (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত সা'দ (রাযি.) বলেন, 'ইসলাম গ্রহণের পর আমি নিজেকে তৃতীয় মুসলমান হিসেবে দেখতে পেলাম।'[৪]

---

[১] আল-কুরআন, ***সুরা আল-আনকাবুত***, ২৯:৮
[২] মুসলিম, ***আস-সহীহ***, খ. ৪, পৃ. ১৮৭৭, হাদীস: ১৭৪৭
[৩] ইবনে খালদুন, ***তারীখু ইবনি খালদুন***, খ. ২, পৃ. ৪১১
[৪] আল-বুখারী, ***আস-সহীহ***, খ. ৫, পৃ. ৭৬, হাদীস: ৩৯৭৩:

আসলে তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নুবুওয়াতপ্রাপ্তির সাথে সাথে ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু অনেকের মতোই তখন তিনি ঘোষণা দেননি। আর একথার সমর্থন পাওয়া যায় তাঁর মায়ের ঘটনা এবং সুরা আল-আনকাবুতের আয়াতটি নাযিলের মাধ্যমে। কারণ এ আয়াতটি নুবুওয়াতের চতুর্থ বছর নাযিল হয়। সম্ভবত এ সময়ই তিনি তাঁর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটি মায়ের নিকট প্রকাশ করেন।

নুবুওয়াতের তৃতীয় বছরে সুলাইম গোত্রের আমর ইবনে আবাসা গোপনে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তখনও প্রকাশ্য দাওয়াতের অনুমতি আল্লাহর তরফ থেকে আসেনি। ইসলাম গ্রহণের পর আমর শিয়াবে আবু তালিবের এক কোণে নামায আদায় করছিলেন। কুরাইশরা প্রস্তর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। তা দেখে দু'একজন মুসলমানের সাথে হযরত সা'দ (রাযি.)ও এগিয়ে এলেন এবং উক্ত কুরাইশ কাফিরদের সাথে তাদের ঝগড়া ও হাতাহাতি শুরু হয়। হযরত সা'দ (রাযি.) তাঁর চাবুকটি দিয়ে এক কাফিরকে বেদম মার দিলেন। লোকটির দেহ রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেল। কোনো মুসলিমানের হাতে কোনো মুশরিকের রক্ত ঝরানোর এ ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসে প্রথম।

হিজরত

হযরত মুসয়াব ইবনে উমাইর (রাযি.) ও হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযি.)-এর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর যে চার ব্যক্তি মদীনায় হিজরত করেন তাঁদের একজন হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.)। *সহীহ আল-বুখারী*তে হযরত বারা ইবনে আযিব (রাযি.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'সর্বপ্রথম আমাদের নিকট আগমণ করেন মুসয়াব ইবনে উমাইর (রাযি.) ও ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযি.)। এ দু'ব্যক্তি মদীনাবাসীদের কুরআন শিক্ষা দিতেন। অতঃপর হযরত বিলাল (রাযি.), হযরত সা'দ (রাযি.) ও হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাযি.) আগমন করেন।'[১]

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: «لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ وَأَنَا ثُلُثُ الْإِسْلَامِ».

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ৬৫–৬৬, হাদীস: ৩৯২৪:

عَنِ الْبَرَاءِ ﷺ، قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، وَبِلَالٌ ﷺ».

ইমাম ইবনে সা'দ (রহ.) *আত-তাবাকাতুল কুবরা* গ্রন্থে ওয়াকিদীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, হযরত সা'দ (রাযি.) ও তাঁর ভাই হযরত উমাইর (রাযি.) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় এসে তাদের অন্য এক ভাই হযরত উতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.)-এর নিকট অবস্থান করেন। তার কয়েক বছর পূর্বেই হযরত উতবা (রাযি.) এক ব্যক্তিকে হত্যা করে মক্কা থেকে পালিয়ে মদীনায় আশ্রয় নেন।[১]

যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

আল্লাহর পথে জিহাদে হযরত সা'দ (রাযি.)-এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাঁর বীরত্ব ও সাহসিকতা ইসলাম-দুশমনদের খুব মারাত্মক পরিণতির দিকে ঠেলে দিয়েছিল। তিনিই প্রথম মুসলিম যিনি আল্লাহর পথে তীর নিক্ষেপ করেন। তিনি নিজেও বলতেন,

«إِنِّيْ لَأَوَّلُ الْعَرَبِ رَمَىٰ بِسَهْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ».

'আমি প্রথম আরব যে আল্লাহর জন্য তীর চালনা করেছিলাম।'[২]

মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের পর বেশ কিছুকাল যাবৎ মুহাজির মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। তাঁদের না ছিল খাদ্য সম্ভার, না ছিল পরিধেয় বস্ত্র এবং না ছিল সুনির্দিষ্ট জীবিকার উপায়-উপকরণ। মক্কা থেকে আগত মুহাজিরদের চাপে মদীনায় সীমিত পরিসরের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিতটি নড়ে উঠেছিল।

মদীনার আনসার-মুহাজির নির্বিশেষে গোটা মুসলিম সমাজ চরম আর্থিক দুর্গতির মধ্যে নিপতিত হয়। এমন চরম দারিদ্রের মধ্যে তাঁরা ইসলামের প্রচার প্রসারের কাজ জারি রাখেন এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। তাঁদের এ চরম দারিদ্র সম্পর্কে হযরত সা'দ (রাযি.) বলেন,

---

[১] ইবনে সা'দ, *আত-তাবাকাতুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ১৩০, হাদীস: ৩২২২:

عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ : لَـمَّا هَـاجَرَ سَـعْدُ وَعُمَـيْرُ ابْنَـا أَبِيْ وَقَّـاصٍ مِـنْ مَكَّـةَ إِلَى الْـمَدِيْنَةِ نَـزَلاَ فِيْ مَنْـزِلٍ لأَخِيْهِمَا عُتْبَةَ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ كَانَ بَنَاهُ فِيْ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَحَائِطٍ لَهُ، وَكَانَ عُتْبَةُ أَصَابَ دَمًا بِمَكَّـةَ فَهَـرَبَ فَنَزَلَ فِيْ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ بُعَاثٍ.

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ২২, হাদীস: ৩৭২৮

«وَكُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّىٰ إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيْرُ أَوِ الشَّاةُ».

'আমরা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতাম, অথচ তখন গাছের পাতা ছাড়া আমাদের খাওয়ার কিছুই থাকতো না। (তা খেয়েই আমরা জীবন ধারণ করতাম) আর আমাদের বিষ্ঠা হত উট-ছাগলের বিষ্ঠার মতো।'[১]

হিজরতের এক বছর পর সফর মাসে রাসুলুল্লাহ (সা.) ষাটজন উষ্ট্রারোহীর একটি দলকে কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ করার উদ্দেশ্যে টহল দিতে পাঠালেন। এ দলে হযরত সা'দ (রাযি.)ও ছিলেন। একপর্যায়ে ইকরিমা ইবনে আবু জাহলের নেতৃত্বে কুরাইশদের বিরাট একটি দল তাঁরা দেখতে পেলেন। কিন্তু উভয় পক্ষ সংঘর্ষ এড়িয়ে গেল। তবে কুরাইশ পক্ষের কেউ একজন হঠাৎ জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলে হযরত সা'দ (রাযি.) সাথে সাথে তীর নিক্ষেপ করলেন। এটিই ছিল ইসলামের ইতিহাসে কাফিরদের প্রতি নিক্ষিপ্ত প্রথম তীর।

হিজরী দ্বিতীয় সালের রবিউস সানী মাসে রাসুলুল্লাহ (সা.) দু'শো সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে বের হলেন। উদ্দেশ্য, মদীনার আশে-পাশে দুশমনের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ এবং দুশমনদের জানিয়ে দেওয়া যে মুসলমানরা ঘুমিয়ে নেই। এ বাহিনীর পতাকাবাহী ছিলেন হযরত সা'দ (রাযি.)। বাওয়াত নামক স্থানে কুরাইশদের সাথে এবার ছোট খাট একটি সংঘর্ষও হয়। এর ছয়মাস পর বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

বদর যুদ্ধের অল্প কয়েকদিন আগে রাসুলুল্লাহ (সা.) কুরাইশ কাফিলার সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিন জনের যে দলটি পাঠান তাদের একজন ছিলেন হযরত সা'দ (রাযি.)। তাঁরা বদরের কূপের নিকট ওৎ পেতে থেকে প্রতিপক্ষের দু'জনকে বন্দী করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট নিয়ে আসেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁদের নিকট থেকে শত্রুপক্ষের অনেক তথ্য অবগত হন।

বদরে সা'দ (রাযি.) ও তাঁর ভাই হযরত উমাইর (রাযি.) অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে লড়েন। প্রত্যেকেই একাধিক কাফিরকে হত্যা করে জাহান্নামে পাঠান। এ যুদ্ধে হযরত উমাইর (রাযি.) শাহাদাত বরণ করেন

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ২২, হাদীস: ৩৭২৮

এবং হযরত সা'দ (রাযি.) সাঈদ ইবনে আ'সকে হত্যা করে তার তলোয়ারখানি নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট সমর্পণ করেন।

তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট তলোয়ারখানি পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। জবাবে তিনি বললেন, এ তলোয়ার না তোমার না আমার। হযরত সা'দ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট থেকে উঠে কিছুদূর যেতে না যেতেই সুরা আনফাল নাযিল হয়। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে ডেকে বলেন, 'তোমার তলোয়ার নিয়ে যাও।'

উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয় বদরের এক বছর পর। হযরত সা'দ (রাযি.) এ যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। কতিপয় মুসলিম সৈনিকের ভুলের কারণে নিশ্চিত বিজয় যখন পরাজয়ে রূপান্তরিত হয়, তখন মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন সৈনিক নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে ঘিরে প্রতিরক্ষা ব্যূহ রচনা করেন, হযরত সা'দ (রাযি.) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইমাম বুখারী (রহ.) এ ঘটনা হযরত সা'দ (রাযি.)-এর জবানেই বর্ণনা করেছেন,

উহুদের দিনে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর তুনীর আমার সামনে ছড়িয়ে দিলেন এবং বললেন, তীর মার! আমার মা-বাবা তোমার প্রতি কুরবান হোক।'[১] ইবনে সা'দ (রহ.) আরও বলেছেন, 'ঘটনাক্রমে একটি তুনীর ফলা ছিল না। হযরত সা'দ (রাযি.) বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ এটা তো খালি। বললেন, 'ওটাও ছুঁড়ে দাও।'

হযরত সা'দ (রাযি.)-এর এক ভাই হযরত উমাইর (রাযি.) বদর যুদ্ধে শহীদ হন। উহুদের যুদ্ধে সা'দ (রাযি.) যখন কাফিরদের প্রবল আক্রমণ থেকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে হিফাযতের জন্য নিজের জীবনবাজি রেখে লড়ছেন, ঠিক তখনই তাঁর অন্য ভাই নরাধম উতবার নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে প্রিয় নবীর মুখ আহত হয় এবং একটি দাঁত ভেঙে যায়।

হযরত সা'দ (রাযি.) প্রায়ই বলতেন, কাফিরদের অন্য কাউকে হত্যার এত প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমার ছিল না যেমন ছিল উতবার ব্যাপারে। কিন্তু যখন আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনলাম, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর চেহারা রক্ত-রঞ্জিত করেছে, তার ওপর আল্লাহর গজব আপতিত হবে, তখন তার হত্যার আকাঙ্ক্ষা আমার নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং আমার অন্তরে প্রশান্তি নেমে আসে।

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ৩৯, হাদীস: ২৯০৫:

عَنْ عَلِيٍّ ﷺ، يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُفَدِّيْ رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «ارْمِ فِدَاكَ أَبِيْ وَأُمِّيْ».

উহুদের যুদ্ধে তিনি এক অস্বাভাবিক দৃশ্য অবলোকন করেন। তিনি বলেন, 'উহুদের দিন আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ডানে ও বামে ধবধবে সাদা দু'ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। কাফিরদের সাথে তারা প্রচণ্ড লড়ছে। এর আগে বা পরে আর কখনও আমি তাদেরকে দেখিনি।'

খন্দকের যুদ্ধ হয় উহুদের দু'বছর পর। এ যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং একজন চতুর কাফির ঘোরসওয়ারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তার চোখ এমনভাবে এফাঁড়-ওফোঁড় করেন যে, তা দেখে রাসুলুল্লাহ (সা.) হঠাৎ হেসে ওঠেন। খন্দকের যুদ্ধে সালা পর্বতের এক উপত্যকায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য একটি তাঁবু নির্মাণ করা হয়। এক ঠাণ্ডার রাতে চাদর মুড়ি দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা.) একাকী শুয়েছিলেন। হঠাৎ তাঁবুর মধ্যে অস্ত্রের ঝনঝনানি শুনতে পেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কে? উত্তর পেলেন, সা'দ আবু ওয়াক্কাসের পুত্র। কি জন্য এসেছ? বললেন, সা'দের হাজার জীবন অপেক্ষা আল্লাহর রাসুল হচ্ছেন তাঁর প্রিয়তম। এ অন্ধকার ঠাণ্ডা রাতে আপনার ব্যাপারে আমার ভয় হল। তাই পাহারার জন্য হাজির হয়েছি। আল্লাহর নবী (সা.) বললেন, 'সা'দ! আমার চোখ খোলা ছিল। আমি আশা করছিলাম আজ যদি কোনো নেককার বান্দা আমার হিফাযত করত!'

হিজরী দশম সনে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিদায়হজের সঙ্গী ছিলেন সা'দও। কিন্তু হজের পূর্বেই মক্কায় তিনি দারুণভাবে পীড়িত হয়ে পড়েন। জীবনের আশা এক প্রকার ছেড়ে দিলেন। এ সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) মাঝে মাঝে এসে তাঁর খোঁজ-খবর নিতেন। হযরত সা'দ (রাযি.) বললেন, একদিন তিনি আমার সাথে কথা বলার পর আমার কপালে হাত রাখলেন। তারপর মুখমণ্ডলের ওপর হাতের স্পর্শ বুলিয়ে পেট পর্যন্ত নিয়ে গেলেন এবং দুআ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি সা'দকে শিফা দান করুন, তার হিজরতকে পূর্ণতা দান করুন। অর্থাৎ হিজরতের স্থান মদীনাতেই তার মৃত্যুদান করুন। হযরত সা'দ (রাযি.) বলতেন, 'রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে সেই শীতল স্পর্শ ও প্রশান্তি আজও আমার অন্তরে অনুভব করে থাকি।' তিনি সুস্থ হয়ে আরও পঁয়তাল্লিশ বছর জীবিত ছিলেন।

হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) ও মুসান্নার নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী পারস্যের কিসরা বাহিনীকে পরাজিত করে ইরাক জয় করে নিয়েছে। ইরাক এখন মুসলিম বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। কিসরার স্বজনবৃন্দ নিজেদের সকল প্রকার মতভেদ ভুলে গিয়ে ইয়াজদিগির্দকে সিংহাসনে বসিয়ে সেনাপতি রুস্তমের

নেতৃত্বে নতুন করে মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণের জন্য বিরাট বাহিনী গড়ে তুলেছে। হযরত ওমর (রাযি.) এ প্রস্তুতির খবর পেলেন। তিনি নিজেই মুসান্নার সাহায্যে একটি বাহিনী নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন। কিন্তু মজলিসে শুরার অনুমতি না পেয়ে শুরার সিদ্ধান্ত মোতাবেক হযরত সা'দ (রাযি.)-কে পাঠালেন এবং তাঁকেই নিযুক্ত করলেন ইরানি ফ্রন্টের সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

হযরত সা'দ (রাযি.) মদীনা থেকে তাঁর বাহিনী নিয়ে কাদেসিয়া পৌঁছলেন। তাঁর পৌঁছার পূর্বেই মুসান্না ইনতিকাল করেন। এ কাদেসিয়া প্রান্তরে সেনাপতি হযরত সা'দ (রাযি.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম ও পারস্য বাহিনীর মধ্যে এক চূড়ান্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বিশাল পারস্য বাহিনীর প্রতিরোধ ব্যূহ তছনছ হয়ে যায় এবং একের পর এক তারা যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে।

সাসানী সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েনের পথে মুসলিম বাহিনী বাহরাসীর দখল করে আছে। এ বাহরাসীর ও মাদায়েনের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ দিজলা নদী প্রবাহিত। হযরত সা'দ (রাযি.) খবর পেলেন, শাহানশাহ ইয়াজদিগির্দ রাজধানী মাদায়েন থেকে সকল মূল্যবান সম্পদ সরিয়ে নিচ্ছে। হযরত সা'দ (রাযি.) সৈন্য বাহিনী নিয়ে দ্রুত মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হলেন। দিজলা তীরে এসে দেখলেন, ইরানিরা নদীর পুলটি পূর্বেই ধ্বংস করে দিয়েছে। এ দিজলার তীরে তিনি মুসিলম মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। ভাষণটির সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

> 'ওহে আল্লাহর বান্দারা, দীনের সিপাহীরা! সাসানী শাসকরা আল্লাহর বান্দাহদেরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে মিথ্যা ও বানোয়াট কথার মাধ্যমে ধোঁকা দিয়ে অগ্নি ও সূর্যের উপাসনা করতে বাধ্য করেছে। তাদের ঘামঝরা কষ্টোপার্জিত সম্পদ নিজেদের পুঞ্জিভূত করেছে। তোমরা যখন তাদের পরিত্রাণদাতা হিসেবে উপস্থিত হয়েছ তখন তারা পালাবার পথ ধরেছে এবং দরিদ্র জনসাধারণের ধন সম্পদ ঘোড়া ও গাধার পিঠে বোঝাই করেছে। আমরা কখনও তাদের এমন সুযোগ দেব না। তাদের বাহনের ওপর বোঝাইকৃত ধন-ভাণ্ডর যাতে আমরা ছিনিয়ে নিতে না পারি এজন্য তারা পুল ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু ইরানিরা আমাদের সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। তারা জানে না আল্লাহর ওপর ভরসাকারীরা, মানবতার সেবকরা, পুল বা

নৌকার ওপর ভরসা করে না। আমি পরম দয়ালু-দাতা আল্লাহর নামে আমার ঘোড়াটি নদীতে নামিয়ে দিচ্ছি। তোমরা আমার অনুসরণ কর। একজনের পেছনে অন্যজন, একজনের পাশে অন্যজন সারিবদ্ধভাবে তোমরা দিজলা পার হও। আল্লাহ তোমাদের সাহায্য ও হিফাযত করুন।'

ভাষণ শেষ করে হযরত সা'দ (রাযি.) বিসমিল্লাহ বলে নিজের ঘোড়াটি নদীর মধ্যে চালিয়ে দিলেন। অন্য মুজাহিদরাও তাঁদের সেনাপতিকে অনুসরণ করলেন। নদী ছিল অশান্ত। কিন্তু আল্লাহর সিপাহীদের সারিতে একটু বিশৃঙ্খলা দেখা দিল না। তাঁরা সারিবদ্ধভাবে নদী পার হয়ে অপর তীরে পৌঁছলেন। ইরানি সৈন্যরা একটু নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিল। তারা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। অবলীলাক্রমে তারা চিৎকার দিয়ে উঠলো, 'দৈত্য আসছে, দানব আসছে। পালাও পালাও।'

মুসলিম মুজাহিদদের এ আকস্মিক হামলায় বাদশাহ ইয়াজদিগির্দ অগণিত ধনরত্ন ফেলে মাদায়েন ত্যাগ করে হালওয়ানের দিকে যাত্রা করে। হযরত সা'দ (রাযি.) নির্জন শ্বেত প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। পরিবেশ ছিল ভয়াবহ। প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষ ছিল যেন শিক্ষা ও উপদেশের স্মারক। হযরত সা'দ (রাযি.)-এর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো সুরা আদ-দুখানের এ আয়াতগুলো:

كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّ عُيُوْنٍ ۝٢٥ وَّ زُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝٢٦ وَّ نَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ۝٢٧
كَذٰلِكَ ۗ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ۝٢٨

'তারা পেছনে ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্য ক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ এবং কত বিলাস-উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত! এমনটি ঘটেছিল এবং আমি এ সবকিছুর উত্তরাধিকারী করেছিলাম অন্য সম্প্রদায়কে।'[১]

হযরত সা'দ (রাযি.) শ্বেত প্রাসাদে প্রবেশ করে আট রাকয়াত সালাতুল ফাতহ আদায় করেন। তারপর তিনি ঘোষণা দেন, এ শাহী প্রাসাদে আজ জুমআর জামাআত অনুষ্ঠিত হবে। অতঃপর মিম্বর তৈরি করে জুমআর নামায আদায় করেন। এটাই ছিল পারস্যে প্রথম জুমআর নামায।

[১] আল-কুরআন, *সুরা আদ-দুখান*, ৪৪:২৫–২৮

হযরত ওমর (রাযি.)-এর আমলে

মাদায়েন বিজয়ের পর খলীফা ওমর (রাযি.) সেনাপতি সা'দ (রাযি.)-কে নির্দেশ দেন, তিনি নিজে যেন ইরানিদের পেছনে ধাওয়া না করেন, বরং এ কাজের জন্য অন্য কাউকে নির্বাচন করে দায়িত্ব দেন। অতঃপর খলীফার আদেশে তিনি অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা, প্রশাসনের পুনর্গঠন, ইসলামের প্রচার-প্রসার এবং নওমুসলিমদের তা'লীম ও তারবিয়াতে আত্মনিয়োগ করেন। যে মাদায়েন ছিল শত শত বছর ধরে অগ্নি উপাসকদের কেন্দ্রভূমি এবং যে মাদায়ের কখনও শোনেনি এক আল্লাহর নাম, সেখানে প্রথম বারের মতো হযরত সা'দ নির্মাণ করেন এক জামে মসজিদ। ইরানের অন্যান্য শহরেও তিনি মসজিদ নির্মাণ করেন। আরব মুসলমানদের বসবাসের জন্য কুফা শহরের সম্প্রসারণ করেন। ইরাকের বাসরা শহরের স্থপতিও তিনি।

খলীফা ওমর (রাযি.) হযরত সা'দ (রাযি.)-কে কুফার গভর্নর নিয়োগ করেন। কিছু দিন পর তাঁর বিরুদ্ধে কতিপয় কুফাবাসীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করেন। কুফায় হযরত সা'দ (রাযি.) নিজের জন্য যে প্রাসাদটি তৈরি করেছিলেন, হযরত ওমর (রাযি.)-এর নির্দেশে মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা মদীনা থেকে কুফা গিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেন।[১]

হযরত সা'দ (রাযি.)-এর বিরুদ্ধে উসামা ইবনে কাতাদা নামক কুফার যে লোকটি খলীফা ওমর (রাযি.)-এর নিকট কসম করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল হযরত সা'দ (রাযি.) তার ওপর বদ-দুআ করে তিনটি জিনিস তার জন্য আল্লাহর নিকট কামনা করেন, আল্লাহ যেন তাকে দীর্ঘজীবী করেন, দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত করেন এবং তার সত্তাকে ফিতনার শিকারে পরিণত করেন। ঐতিহাসিকরা বলেছেন, তাঁর এ দুআ অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ তিনি তো ছিলেন মুজতাজাবুদ দাওয়াত। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর জন্য দুআ করেছেন, 'হে আল্লাহ! আপনি সা'দের দুআ কবুল করুন, যখন সে দুআ করবে।'

হযরত ওমর (রাযি.) হযরত সা'দ (রাযি.)-এর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ যে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন তা কিন্তু ঠিক নয়। তাই তিনি বলেছেন, 'আমি সা'দকে রাষ্ট্র প্রশাসনে অযোগ্য বা তাঁর প্রতি আস্থাহীনতার কারণে বরখাস্ত করিনি।'

[১] ইবনে তায়মিয়া, *মাজমুউল ফাতাওয়া*, খ. ৩৫, পৃ. ৪০

হযরত সা'দ (রাযি.) যে খলীফা ওমর (রাযি.)-এর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাসভাজন ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় মৃত্যুর পূর্বে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট যে বোর্ডটি গঠন করে দিয়ে যান তাতে হযরত সা'দ (রাযি.)-এর অন্তর্ভুক্তির মধ্যে। হযরত সা'দ (রাযি.) সম্পর্কে তাঁর অন্তিম বাণী ছিল: 'যদি খিলাফতের দায়িত্ব সা'দ পেয়ে যান তাহলে তিনি তার উপযুক্ত। আর তা যদি না হয় তবে যিনি খলীফা হবেন তিনি যেন তাঁর সাহায্য গ্রহণ করেন।'

হযরত উসমান (রাযি.)-এর আমলে

হযরত উসমান (রাযি.) তাঁর খিলাফতের প্রথম বছরেই পুনরায় হযরত সা'দ (রাযি.)-কে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে কুফার কোষাধ্যক্ষ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) ও তাঁর মধ্যে কোনো একটি বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় খলীফা হযরত সা'দ (রাযি.)-কে প্রত্যাহার করেন।

ইবনে সাবার সহযোগী হাঙ্গামাবাজরা খলীফা হযরত উসমান (রাযি.)-কে ঘেরাও করার উদ্দেশ্যে মদীনায় প্রবেশ করেছে। খলীফা মসজিদে নববীতে জুমআর নামাযের খুতবার মধ্যে হাঙ্গামাবাজদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করলেন। তারাও পাথর নিক্ষেপ করে খলীফাকে আহত করে। এ সময় তাদের প্রতিরোধে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন হযরত সা'দ (রাযি.)। তারপর অন্যান্য সাহাবীরা একযোগে উঠে তাদের হটিয়ে দেন।

বিদ্রোহীদের হাতে হযরত উসমান (রাযি.) শহীদ হলেন। হযরত সা'দ (রাযি.) তখন মদীনায়। মদীনাবাসীরা হযরত আলী (রাযি.)-কে খলীফা মনোনীত করে তাঁর হাতে বায়আত করলেন। হযরত আলী (রাযি.)-এর হাতে বায়আতের জন্য লোকেরা যখন হযরত সা'দ (রাযি.)-এর বাড়িতে গেল তিনি তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'যতক্ষণ না সব মানুষ বায়আত করেছে আমি করব না। তবে আমার পক্ষ থেকে কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই।'

হযরত আলী (রাযি.)-এর আমলে

হযরত উসমান (রাযি.)-এর হত্যাকাণ্ডের পর ইসলামের ইতিহাসে যে বেদনাদায়ক অধ্যায়ের সূচনা হয় তার আলোচনা এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব

নয়। তবে এ সময় হযরত সা'দ (রাযি.)-এর ভূমিকা বোঝার জন্য এততটুকু ইঙ্গিত প্রয়োজন যে, সে সময় ইসলামি উম্মত তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদল হযরত আলী (রাযি.)-এর পক্ষে, একদল তাঁর বিপক্ষে এবং একদল নিরপেক্ষ। হযরত আলী (রাযি.)-এর পক্ষে, বিপক্ষের উভয় দলেই যেমন বিশিষ্ট সাহাবীরা ছিলেন, তেমনিভাবে ছিলেন এ নিরপেক্ষ দলেও। তাঁরা কোনো মুসলমানের পক্ষে-বিপক্ষে তরবারি উত্তোলনকে জায়েয মনে করেননি। এ কারণে আমরা হযরত সা'দ (রাযি.)-কে দেখতে পাই তিনি উট বা সিফফিনের যুদ্ধে কোনো পক্ষেই যোগ দেননি, তখন তিনি মদীনায় নিজ গৃহে অবস্থান করছেন।

মোটকথা হযরত উসমান (রাযি.)-এর শাহাদাতের পর তিনি নির্জনতা অবলম্বন করেন। একবার তিনি তাঁর উটের আস্তাবলে তাঁর পুত্র ওমরকে আসতে দেখে বললেন, 'আল্লাহ এ অশ্বারোহীর অনিষ্ট থেকে আমাকে রক্ষা করুন।' অতঃপর ওমর এসে পিতাকে বললেন, 'আপনি উট ও ছাগলের মধ্যে সময় অতিবাহিত করছেন, আর এদিকে লোকেরা রাষ্ট্রীয় ঝগড়ায় লিপ্ত।' হযরত সা'দ (রাযি.) পুত্রের বুকের ওপর হাত দিয়ে আঘাত করে বললেন, 'চুপ কর!' আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ ভালবাসেন নির্জনবাসী, মুত্তাকী এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় যে মানুষের রাগ বিরাগের পরোয়া করে না তাকে।

হযরত সা'দ (রাযি.) হযরত আলী (রাযি.)-এর হাতে বায়আত করে পুনরায় তাঁর দলত্যাগী খারিজীদের ফাসিক বলে মনে করতেন। হযরত উসমান (রাযি.)-এর শাহাদাতের পর তাঁর পুত্র ওমর তাঁর নিকট এসে বলেন, খিলফাত পরিচালনার জন্য এখন উম্মতে মুসলিমার একজন বিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন। আমাদের ধারণায় আপনিই এর উপযুক্ত। এতটুকু বলতেই তিনি বলে ওঠেন, 'থাক, হয়েছে। আমাকে আর উৎসাহিত করতে হবে না।'

ওফাত

হযরত সা'দ (রাযি.) মদীনা থেকে দশ মাইল দূরে আকীক উপত্যকায় কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর ইনতিকাল করেন। জীবনীকারদের মধ্যে তাঁর মৃত্যুসন সম্পর্কে মতভেদ আছে। তবে হিজরী ৫৫ সালে ৮৫ বছর বয়সে তাঁর ইনতিকাল হয় বলে সর্বাধিক প্রসিদ্ধি আছে। হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.) তাঁর *তাহযীব* গ্রন্থে এ মতই সমর্থন করেছেন। গোসল ও

কাফনের পর লাশ মদীনায় আনা হয়। মদীনার তৎকালীন গভর্নর মারওয়ান জানাযার ইমামতি করেন। *সহীহ মুসলিমে*র একাধিক বর্ণনার মাধ্যমে তাঁর জানাযার বিষয়টি বিস্তারিত জানা যায়।

হযরত সা'দ (রাযি.)-এর ইনতিকালের পর উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়িশা (রাযি.) ও অন্যান্য আযওয়াজে মুতাহহারাত বলে পাঠালেন, তাঁর লাশ মসজিদে আনা হোক, যাতে আমরা জানাযার শরীক হতে পারি। কিন্তু লোকেরা লাশ মসজিদে নেওয়া যেতে পারে কিনা এ ব্যাপারে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল। হযরত আয়িশা (রাযি.) একথা জানতে পেরে বললেন, 'তোমরা এত তাড়াতাড়িই ভুলে যাও? রাসুলুল্লাহ (সা.) তো সুহাইল ইবনে বায়দার জানাযা এ মসজিদে আদায় করেছেন।' অতঃপর লাশ উম্মুহাতুল মুমিনীনের হুজরার নিকট আনা হল এবং তাঁরা নামায আদায় করলেন।

মরণকালে হযরত সা'দ (রাযি.) বহু অর্থ-সম্পদের অধিকারী ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি একটি অতিপুরাতন পশমী জুববা চেয়ে নিয়ে বলেন, 'এ দিয়েই তোমরা আমাকে কাফন দেবে। এ জুব্বা পরেই আমি বদর যুদ্ধে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়েছি। আমার ইচ্ছা, এটা নিয়েই আমি আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হই।'

হযরত সা'দ (রাযি.)-এর ছেলে মুসয়াব বলেন, আমার পিতার অন্তিম সময়ে তাঁর মাথাটি আমার কোলের ওপর ছিল। তাঁর মুমূর্ষ অবস্থা দেখে আমার চোখে পানি এসে গেল। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বেটা কাঁদছ কেন? বললাম, আপনার এ অবস্থা দেখে। বললেন, 'আমার জন্য কেঁদো না। আল্লাহ কখনো আমাকে শাস্তি দেবেন না, আমি জান্নাতবাসী। আল্লাহ মুমিনদেরকে তাঁদের সৎকাজের প্রতিদান দেবেন এবং কাফিরদের সৎকাজের বিনিময়ে তাদের শাস্তি লাঘব করবেন।'[১]

ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা

রাসুলুল্লাহ (সা.), খুলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের নিকট হযরত সা'দ (রাযি.)-এর মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল অতি উচ্চে। তাঁরা তাঁর মতামতকে যে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করতেন, বহু হাদীসের মাধ্যমে একথা জানা যায়। একবার হযরত সা'দ (রাযি.) মোজার ওপর মসেহ সংক্রান্ত একটি হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) তাঁর

[১] মুহাম্মদ ইউসুফ আল-কান্ধলওয়ী, *হায়াতুস সাহাবা*, খ. ৪, পৃ. ৬৭–৬৮

পিতা হযরত ওমর ফারুক (রাযি.) থেকে হাদীসটির সত্যতা যাচাই করতে চাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হাদীসটি কি সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস থেকে শুনেছ? বললেন, 'হ্যাঁ। হযরত ওমর (রাযি.) বললেন, হ্যাঁ, সা'দ যখন তোমাদের নিকট কোনো হাদীস বর্ণনা করে, তখন সে সম্পর্কে অন্য কারো নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করবে না।'

ইবনে ইসহাক (রহ.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে চারজন ছিলেন সর্বাধিক কঠোর: হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত যুবাইর, হযরত সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুম।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবদ্দশায় হযরত বিলাল (রাযি.)-এর অনুপস্থিতিতে হযরত সা'দ (রাযি.) তিনবার আযান দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, 'আমার সঙ্গে বিলালকে না দেখলে তুমি আযান দেবে।'[১]

হযরত সা'দ রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর নিকট থেকে তাঁর ছেলে-মেয়েরা যেমন– ইবরাহীম, আমের, মুসয়াব, মুহাম্মদ, আয়িশা এবং বিশিষ্ট সাহাবীরা যেমন– হযরত আয়িশা (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.), হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রাযি.) ও বিশিষ্ট তাবেয়ীরা যেমন– সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.), হযরত আবু উসমান আন-নাহদী (রহ.), হযরত কায়িস ইবনে আবু হাযিম (রহ.), হযরত আলকামা (রহ.), হযরত আহনাফ (রহ.) ও অন্যরা হাদীস বর্ণনা করেছেন।

কাব্যপ্রতিভা

হযরত সা'দ (রাযি.)-এর মধ্যে কাব্য প্রতিভাও ছিল। প্রাচীন সূত্রগুলোতে তাঁর কিছু কবিতা সংকলিত হয়েছে। হাফিয ইবনে হাজার আল-আসকলানী (রহ.) *আল-ইসাবা* গ্রন্থে কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত করেছেন। হযরত সা'দ (রাযি.)-এর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি আশারায়ে মুবাশ্‌শারাহ অর্থাৎ জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজনের অন্যতম এবং তিনি এ দলের সর্বশেষ ব্যক্তি যিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

[১] মুহাম্মদ ইউসুফ আল-কান্ধলওয়ী, *হায়াতুস সাহাবা*, খ. ৪, পৃ. ১৫২

৯
হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জার্‌রাহ (রাযি.)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'লিকুল্লি উম্মাতিন আমীনুন, ওয়া আমীনু হাজিহিল উম্মাহ আবু উবাইদা

«لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنٌ، وَأَمِيْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ».

'প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে। আর এ মুসলিম জাতির পরম বিশ্বাসী ব্যক্তি আবু উবাইদা।'[১]

তিনি ছিলেন উজ্জ্বল মুখমণ্ডল, গৌরকান্তি, হালকা পাতলা গড়ন ও দীর্ঘদেহের অধিকারী। তাঁকে দেখলে যেকোনো ব্যক্তির চোখ জুড়িয়ে যেত, সাক্ষাতে অন্তরে ভক্তি ও ভালবাসার উদয় হত এবং হৃদয়ে একটা নির্ভরতার ভাব সৃষ্টি হত। তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাবী, অত্যন্ত বিনয়ী ও লাজুক প্রকৃতির। তবে যেকোনো সংকট মুহূর্তে সিংহের ন্যায় চারিত্রিক দৃঢ়তা তাঁর মধ্যে ফুটে উঠত। তাঁর চারিত্রিক দীপ্তি ও তীক্ষ্ণতা ছিল তরবারির ধারের ন্যায়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ভাষায় তিনি ছিলেন উম্মতে মুহাম্মদীর আমীন (বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি)।

নাম-নসব ও বংশ

তাঁর পুরো নাম: আমীল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ আল-ফিহরী আল-কুরাইশী। তবে কেবল আবু উবাইদা নামে তিনি সবার কাছে পরিচিত। তাঁর পঞ্চম ঊর্ধ্বপুরুষ 'ফিহরের' মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে। তাঁর মা-ও ফিহরী খান্দানের কন্যা। সীরাত বিশেষজ্ঞদের মতে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর মন্তব্য হচ্ছে, 'কুরাইশদের তিন ব্যক্তি অন্য সকলের থেকে সুন্দর চেহারা, উত্তম চরিত্র ও স্থায়ী লজ্জাশীলতার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁরা তোমাকে কোনো কথা বললে মিথ্যা

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ১৭২, হাদীস: ৪৩৮২

বলবেন না, আর তুমি তাদেরকে কিছু বললে তোমাকে মিথ্যুক মনে করবেন না। তাঁরা হলেন আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.), হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাযি.) ও হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাযি.)।'

ইসলাম গ্রহণ

ইসলাম প্রচারের প্রথম ভাগেই যাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর মুসলমান হওয়ার পরের দিনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর হাতেই তিনি তাঁর ইসলামের ঘোষণা দেন। তারপর তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাযি.), হযরত উসমান ইবনে মাযউন (রাযি.), হযরত আল-আরকাম ইবনে আবুল আরকাম (রাযি.) ও তাঁকে সঙ্গে করে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হাজির হন। সেখানে যারা সকলেই একযোগে ইসলামের ঘোষণা দেন। এভাবে তাঁরাই হলেন মহান ইসলামি ইমারতের প্রথম ভিত্তি।

হিজরত

মক্কায় মুসলিমদের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) শরীক ছিলেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি অটল থেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বাসের চূড়ান্ত পরীক্ষায় কামিয়াব হন। কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে দু'বার হাবশায় হিজরত করেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে হিজরতের পর তিনিও মদীনায় হিজরত করেন।

যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

মদীনায় হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রাযি.)-এর সাথে তাঁর দীনী মুয়াখাত বা দীনী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বদর যুদ্ধের দিন হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-এর পরীক্ষার কঠোরতা ছিল সকল ধ্যান-ধারণা ও কল্পনার ঊর্ধ্বে। যুদ্ধের ময়দানে এমন বেপরোয়াভাবে কাফিরদের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকেন যেন তিনি মৃত্যুর প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। মুশরিকরা তাঁর আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের অশ্বারোহী সৈনিকরা প্রাণের ভয়ে দিশেহারা হয়ে দিকবিদিক পালাতে থাকে। কিন্তু শত্রুপক্ষের এক ব্যক্তি বার বার ঘুরে ফিরে তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল।

আর তিনিও তার সামনে থেকে সরে যেতে লাগলেন যেন তিনি সাক্ষাৎ এড়িয়ে যাচ্ছেন। লোকটি ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করল। হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) সেখানেও তাকে এড়িয়ে চলতে লাগলেন। অবশেষে সে শত্রুপক্ষ ও হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-এর মাঝখানে এসে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। যখন তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল, তিনি তাঁর তরবারির এক আঘাতে লোকটির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছন্ন করে ফেলেন। লোকটি মাটিতে গড়িয়ে পড়ল

লোকটি কে? সে আর কেউ নয়। সে আবু উবাইদার পিতা আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ। প্রকৃতপক্ষে হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) তাঁর পিতাকে হত্যা করেননি, তিনি তাঁর পিতার আকৃতিতে শিরক বা পৌত্তলিকতা হত্যা করেছেন। এ ঘটনার পর আল্লাহ তাআলা হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) ও তাঁর পিতার শানে নিম্নের এ আয়াতটি নাযিল করেন,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ وَ لَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَ اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَ يُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۲۲﴾

‘তোমরা কখনো এমনটি দেখতে পাবে না যে, আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার লোকেরা কখনো তাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে তারা তাদের পিতা-ই হোক কিংবা তাদের পুত্র-ই হোক বা ভাই হোক অথবা তাদের বংশ-পরিবারের লোক। তারা সেই লোক যাদের দিলে আল্লাহ তাআলা ঈমান দৃঢ়মূল করে দিয়েছেন এবং নিজের তরফ হতে একটা রূহ দান করে তাদেরকে এমন সব জান্নাতে দাখিল করবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান হবে। তাতে তারা চিরদিন থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও সন্তুষ্ট হয়েছেন তাঁর প্রতি। এরা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রাখ, আল্লাহর দলের লোকেরাই কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।’[১]

[১] আল-কুরআন, *সুরা আল-মুজাদিলা*, ৫৮:২২

হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-এর এরূপ আচরণে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ আল্লাহর প্রতি তাঁর দৃঢ় ঈমান, দীনের প্রতি নিষ্ঠা, এবং উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি তাঁর আমানতদারী তাঁর মধ্যে এমন চূড়ান্ত রূপলাভ করেছিল যে, তা দেখে অনেক মহান ব্যক্তিও ঈর্ষা পোষণ করতেন। মুহাম্মদ ইবনে জাফর বলেন, ‘খ্রিস্টানদের একটা প্রতিনিধি দল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দরবারে হাজির হয়ে বললো, হে আবুল কাসিম! আপনার সাথীদের মাঝ থেকে আপনার মনোনীত কোনো একজনকে আমাদের সাথে পাঠান। তিনি আমাদের কিছু বিতর্কিত সম্পদের ফায়সালা করে দেবেন। আপনাদের মুসলিম সমাজ আমাদের সবার কাছে মনোপূত ও গ্রহণযোগ্য।

একথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, ‘সন্ধ্যায় তোমরা আমার কাছে আবার এসো। আমি তোমাদের সাথে একজন দৃঢ়চেতা ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে পাঠাব।’ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) বলেন, ‘আমি সেদিন সকাল সকাল যুহরের নামায আদায়ের জন্য মসজিদে উপস্থিত হলাম। আর আমি এ দিনের মতো আর কোনো দিন নেতৃত্বের জন্য লালায়িত হইনি। এর একমাত্র কারণ আমিই যেন হতে পারি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর এ প্রশংসার পাত্রটি।

রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের সাথে যুহরের নামায শেষ করে ডানে-বায়ে তাকাতে লাগলেন। আর আমিও তাঁর নজরে আসার জন্য আমার গর্দানটি একটু উঁচু করতে লাগলাম। কিন্তু তিনি তাঁর চোখ ঘোরাতে ঘোরাতে এক সময় হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাযি.)-কে দেখতে পেলেন। তাঁকে ডেকে তিনি বললেন, ‘তুমি তাদের সাথে যাও এবং সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে তাদের বিতর্কিত বিষয়টির ফায়সালা করে দাও।’ আমি তখন মনে মনে বললাম, আবু উবাইদা এ মর্যাদাটি ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) কেবল একজন আমানতদারই ছিলেন না, আমানতদারির জন্য সর্বদা সকল শক্তি পুঞ্জিভূত করতেন। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে কুরাইশ কাফিলার গতিবিধি অনুসরণের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) একদল সাহাবীকে পাঠান। তাঁদের আমীর নিযুক্ত করেন হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-কে। পাথেয় হিসেবে তাঁদেরকে কিছু খোরমা দেওয়া হয়। প্রতিদিন হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) তাঁর প্রত্যেক সঙ্গীকে মাত্র একটি খোরমা দিতেন। তাঁরা শিশুদের মায়ের স্তন চোষার ন্যায় সারাদিন সেই খোরমাটি চুষে চুষে এবং পানি পান করে কাটিয়ে দিত। এভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাত্র একটি খোরমাই তাঁদের জন্য যথেষ্ট ছিল।

কোনো কোনো বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, অষ্টম হিজরীতে রজব মাসে রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-এর নেতৃত্বে উপকূলীয় এলাকায় কুরাইশদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য একটি বাহিনী পাঠান। কিছু খেজুর ছাড়া তাঁদের সাথে আর কোনো পাথেয় ছিল না। সৈনিকদের প্রত্যেকের জন্য দৈনিক বরাদ্দ ছিল মাত্র একটি খেজুর। এ একটি খেজুর খেয়েই তাঁরা বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁদের এ বিপদ দূর করেন। সাগর তীরে তাঁরা বিশাল আকৃতির এক মাছ লাভ করেন এবং তার ওপর নির্ভর করেই তাঁরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। হয়তো এ দুটি পৃথক পৃথক ঘটনা ছিল।

উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন পরাজয় বরণ করে এবং মুশরিকরা জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে থাকে, মুহাম্মদ কোথায়, মুহাম্মদ কোথায়...? তখন হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) ছিলেন সেই দশ ব্যক্তির অন্যতম যারা বুক পেতে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে মুশরিকদের তীর থেকে রক্ষা করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে দেখা গেল রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দাঁত শহীদ হয়েছে, তাঁর কপাল রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে এবং গণ্ডদেশে বর্মের দুটি বেড়ি বিঁধে গেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) বেড়ি দুটিকে উঠিয়ে ফেলার জন্য তড়িঘড়ি এগিয়ে এলেন।

হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) তাঁকে বললেন, 'কসম আল্লাহর! আপনি আমাকে ছেড়ে দিন।' তিনি ছেড়ে দিলেন। হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) ভয় করলেন হাত দিয়ে বেড়ি দুটি তুললে রাসুলুল্লাহ (সা.) হয়তো কষ্ট পাবেন। তিনি শক্তভাবে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে প্রথমে একটি তুলে ফেললেন। কিন্তু তাঁরও অন্য একটি দাঁত ভেঙে গেল। তখন হযরত আবু বকর (রাযি.) মন্তব্য করলেন, 'আবু উবাইদা সর্বোত্তম ব্যক্তি।'

খন্দক ও বনি কুরাইযা অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। হুদাইবিয়ার ঐতিহাসিক চুক্তিতে তিনি একজন সাক্ষী হিসেবে সাক্ষর করেন। খায়বার অভিযানে সাহস ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। জাতুস সালাসিল অভিযানে হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.)-এর বাহিনীর সাহায্যের জন্য ২০০ সিপাহীসহ রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-কে পিছনে পাঠান। তাঁরা জয়লাভ করেন। মক্কা বিজয়, তায়িফ অভিযানসহ সর্বক্ষেত্রে আবু উবাইদা শরীক ছিলেন। বিদায় হজেও তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন।

হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর আমলে

ইসলাম গ্রহণের পর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) সর্বক্ষেত্রে ছায়ার ন্যায় সর্বদা তাঁকে অনুসরণ করেন। সাকীফায়ে বনি সায়িদাতে খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে তুমুল বাক-বিতণ্ডা চলছে। হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) আনসারদের লক্ষ করে এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিলেন। তাদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন,

يا معشر الأنصار! إنكم كنتم أول من نصر، فلا تكونوا أول من غير وبدل.

'ওহে আনসার সম্প্রদায়! তোমরাই প্রথম সাহায্যকারী। আজ তোমরাই প্রথম বিভেদ সৃষ্টিকারী হয়ো না।'[১]

একপর্যায়ে হযরত আবু বকর (রাযি.) হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-কে বলেন, আপনি হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে বায়আত করি। আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'প্রত্যেক জাতিরই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি আছে, তুমি এ জাতির সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি।'

এর জবাবে আবু উবাইদা (রাযি.) বললেন, 'আমি এমন ব্যক্তির সামনে হাত বাড়াতে পারি না যাকে রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদের নামাযের ইমামতির আদেশ করেছেন এবং যিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ইমামতি করেছেন।' একথার পর হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর হাতে বায়আত করা হল। হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর খলীফা হওয়ার পর সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সর্বোত্তম উপদেষ্টা ও সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেন। হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর পর হযরত ওমর (রাযি.) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আবু উবাইদা (রায.) তাঁরও আনুগত্য মেনে নেন।

হযরত আবু বকর (রাযি.) খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর হিজরী ১৩ সনে সিরিয়ায় অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-কে হিমস, হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রাযি.)-কে দিমাশক, হযরত শুরাহবীল (রাযি.)-কে জর্দান ও হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.)-কে ফিলিস্তীনে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিয়োগ করলেন হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-কে।

---

[১] আল-ইয়াকুবী, *তারীখুল ইয়াকুবী*, খ. ২, পৃ. ১২৩

হযরত ওমর (রাযি.)-এর আমলে

দিমাশক, হিমস ও লাজিকিয়া প্রভৃতি শহর বিজিত হয় আবু উবাইদা (রাযি.)-এর হাতে। ইয়ারমুকের সেই ভয়াবহ যুদ্ধ তিনিই পরিচালনা করেন। হযরত আমর ইবনুল আসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বায়তুল মাকদাস বিজয়ে শরীক হন। বায়তুল মাকদাসবাসীরা খোদ খলীফা ওমর (রাযি.)-এর সাথে সন্ধির ইচ্ছা প্রকাশ করলে হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-ই সে কথা জানিয়ে খলীফাকে পত্র লিখেন।

সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করার জন্য খলীফা 'জাবিয়া' পৌঁছলে আবু উবাইদাহ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। হিজরী ১৭ সনে হযরত খালিদ সাইফুল্লাহকে দিমাশ্কের আমীর ও ওয়ালীর পদ থেকে অপসারণ করে খলীফা ওমর আবু উবাইদাকে তাঁর স্থলে নিয়োগ করেন। হযরত খালিদ সাইফুল্লাহ লোকদের বলেন, 'তোমাদের খুশি হওয়া উচিৎ যে, আমীনুল উম্মত তোমাদের ওয়ালী।'

হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী সিরিয়ায় একের পর এক বিজয় লাভ করে সিরিয়ার সমগ্র ভূখণ্ড দখল করে চলেছে। এ সময় সিরিয়ায় মহামারী আকারে প্লেগ দেখা দেয় এবং প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ তার শিকারে পরিণত হয়। খলীফা হযরত ওমর (রাযি.) নিজেই খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য রাজধানী মদীনা থেকে 'সারগ' নামক স্থানে পৌঁছুলেন। অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) সেখানে খলীফাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

প্রবীণ মুহাজির ও আনসারদের সাথে বিষয়টি নিয়ে পরামর্শ করলেন। সবাই একবাক্যে সেনাবাহিনীর সদস্যদের স্থান ত্যাগের পক্ষে মত দিলেন। হযরত ওমর (রাযি.) সবাইকে আহ্বান জানালেন তাঁর সাথে আগামী কাল মদীনায় ফিরে যাওয়ার জন্য। তাকদীরের প্রতি গভীর বিশ্বাসী হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) বেঁকে বসলেন। খলীফাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,

أَفِرَارًا مِّنْ قَدَرِ اللهِ؟

'একি আল্লাহর তাকদীর থেকে পলায়ন নয়?'[১]

খলীফা দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'আফসুস! আপনি ছাড়া কথাটি অন্য কেউ যদি বলতো! হ্যাঁ, আল্লাহর তাকদীর থেকে পালাচ্ছি। তবে অন্য এক

[১] মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ৪, পৃ. ১৭৪০, হাদীস: ২২১৯

তাকদীরের দিকে। হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) তাঁর বাহিনীসহ সেখানে থেকে গেলেন। খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর (রাযি.) মদীনা পৌঁছে দূত মারফত আবু উবাইদা (রাযি.)-কে একখানা পত্র পাঠান। পত্রে তিনি লিখেন, 'আপনাকে আমার খুবই প্রয়োজন। অত্যন্ত জরুরিভাবে আপনাকে আমি তলব করছি। আমার এ পত্রখানি যদি রাতের বেলা আপনার কাছে পৌঁছে তাহলে সকাল হওয়ার পূর্বেই রওয়ানা দেবেন। আর যদি দিনের বেলা পৌঁছে তাহলে সন্ধ্যার পূর্বেই রওয়ানা দেবেন।'

খলীফা ওমর (রাযি.)-এর এ পত্রখানি হাতে পেয়ে তিনি মন্তব্য করেন, 'আমার কাছে আমীরুল মুমিনীনের প্রয়োজনটা কি তা আমি বুঝেছি। যে বেঁচে নেই তাকে তিনি বাঁচাতে চান। তারপর তিনি লিখলেন, 'আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার প্রয়োজনটা বুঝেছি। আমি তো মুসলিম মুজাহিদদের মাঝে অবস্থান করছি। তাদের ওপর যে মুসিবাত আপতিত হয়েছে তা থেকে আমি নিজেকে বাঁচানোর প্রত্যাশী নই। আমি তাদেরকে ছেড়ে যেতে চাই না, যতক্ষণ না আল্লাহ আমার ও তাঁদের মাঝে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেন। আমার এ পত্রখানি আপনার হাতে পৌঁছার পর আপনি আপনার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করুন এবং আমাকে এখানে অবস্থানের অনুমতি দান করুন।'

হযরত ওমর (রাযি.) এ পত্রখানি পাঠ করে এত ব্যাকুলভাবে কেঁদেছিলেন যে, তাঁর দু'চোখ থেকে ঝর ঝর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর এ কান্না দেখে তার আশেপাশের লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আমীরুল মুমিনীন! আবু উবাইদা কি ইনতিকাল করেছেন?' তিনি বলেছিলেন, 'না। তবে তিনি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে।'

ওফাত

হযরত ওমর (রাযি.)-এর ধারণা মিথ্যা হয়নি। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি প্লেগে আক্রান্ত হন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাঁর সেনাবাহিনীকে লক্ষ করে উপদেশমূলক একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, 'তোমাদেরকে যে উপদেশটি আমি দিচ্ছি তোমরা যদি তা মেনে চলো তাহলে সবসময় কল্যাণের পথেই থাকবে। তোমরা নামায কায়েম করবে, রমাদান মাসে রোযা রাখবে, যাকাত দান করবে, হজ ও ওমরা আদায় করবে, একে অপরকে উপদেশ দেবে, তোমাদের শাসক ও নেতৃবৃন্দকে সত্য ও ন্যায়ের কথা বলবে, তাদের কাছে কিছু গোপন রাখবে না এবং দুনিয়ার সুখ সম্পদে গা ভাসিয়ে

দেবে না। কোনো ব্যক্তি যদি হাজার বছরও জীবন লাভ করে, আজ আমার পরিণতি তোমরা দেখতে পাচ্ছ তারও এ একই পরিণতি হবে।'

সকলকে সালাম জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন। অতঃপর মুআয ইবনে জাবালের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'মুআয! তুমি নামাযের ইমামতি কর।' এর পরপরই তাঁর রূহটি পবিত্র দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরম সত্তার দিকে ধাবিত হয়। মুআয উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত সকলকে লক্ষ করে বলেন, লোক সকল! তোমরা এ ব্যক্তির তিরোধানে ব্যথা ভারাক্রান্ত। আল্লাহর কসম! আমি এ ব্যক্তির থেকে অধিক কল্যাণদৃপ্ত বক্ষ, পরিচ্ছন্ন হৃদয়, পরকালের প্রেমিক এবং জনগণের উপদেশ দানকারী আর কোনো ব্যক্তিকে জানিনা। তোমরা তাঁর প্রতি রহম কর, আল্লাহও তোমাদের প্রতি রহম করবেন। এটা হিজরী ১৮ সনের ঘটনা।

এরপর লোকেরা সমবেত হয়ে হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-এর মরদেহ বের করে আনলো। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযি.)-এর ইমামতিতে তাঁর জানাযা অনুষ্ঠিত হল। হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রায.), হযরত আমর ইবনুল আস (রাযি.) ও হযরত দাহহাক ইবনে কায়েস (রাযি.) কবরের মধ্যে নেমে তাঁর লাশ মাটিতে শায়িত করেন। কবরে মাটিচাপা দেওয়ার পর হযরত মুআয (রাযি.) এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে তাঁর প্রশংসা করে বলেন,

> 'আবু উবাইদা, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন! আল্লাহর কসম! আমি আপনার সম্পর্কে যতটুকু জানি কেবল ততটুকুই বলবো, অসত্য কোনো কিছু বলবো না। কারণ আমি আল্লাহর শাস্তির ভয় করি। আমার জানা মতে আপনি ছিলেন আল্লাহকে অত্যধিক স্মরণকারী, বিনম্রভাবে জমিনের ওপর বিচরণকারী ব্যক্তিদের একজন। আর আপনি ছিলেন সেইসব ব্যক্তিদের অন্যতম যারা তাদের রবের উদ্দেশ্যে সাজদারত ও দাঁড়ানোর অবস্থায় রাত্রি অতিবাহিত করে এবং যারা খরচের সময় অপচয়ও করে না, কার্পণ্যও করে না, বরং মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করে থাকে। আল্লাহর কসম; আমার জানা মতে আপনি ছিলেন বিনয়ী এবং ইয়াতিম-মিসকীনদের প্রতি সদয়। আপনি ছিলেন অত্যাচারী অহংকারীদের শত্রুদেরই একজন।'

আমল-আখলাক

খাওফে খোদা, ইত্তেবায়ে সুন্নাত, তাকওয়া, বিনয়, সাম্যের মনোভাব, স্নেহ ও দয়া ছিল তাঁর চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। একদিন একটি লোক হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-এর বাড়িতে গিয়ে দেখতে পেল, তিনি হাউমাউ করে কাঁদছেন। লোকটি জিজ্ঞাসা করলো, ব্যাপার কি আবু উবাইদা! এত কান্নাকাটি কেন? তিনি বলতে লাগলেন, 'একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) মুসলমানদের ভবিষ্যত বিজয় ও ধন-ঐশ্বর্যের আলোচনা প্রসঙ্গে সিরিয়ার প্রসঙ্গ উঠালেন। বললেন, 'আবু উবাইদা তখন যদি তুমি বেঁচে থাক, তাহলে তিনটি খাদেমই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। একটি তোমার নিজের, একটি পরিবার-পরিজনের এবং অন্যটি তোমার সফরে সঙ্গী হওয়ার জন্য। অনুরূপভাবে তিনটি বাহনও যথেষ্ট মনে করবে। একটি তোমার, একটি তোমার খাদেমের এবং একটি তোমার জিনিসপত্র পরিবহনের জন্য।' কিন্তু এখন দেখছি, আমার বাড়ি খাদেমে এবং আস্তাবল ঘোড়ায় ভরে গেছে। হায়, আমি কিভাবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে মুখ দেখাবো? রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছিলেন, সেই ব্যক্তিই আমার সর্বাধিক প্রিয় হবে, যে ঠিক সেই অবস্থায় আমার সাথে মিলিত হবে যে অবস্থায় আমি তাকে ছেড়ে যাচ্ছি।'[১]

খলীফা হযরত ওমর (রাযি.) সিরিয়া সফরের সময় দেখতে পেলেন, অফিসারদের গায়ে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ। তিনি এতই ক্ষেপে গেলেন যে, ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন এবং তাদের দিকে পাথরের টুকরো নিক্ষেপ করতে করতে বললেন, তোমরা এতো তাড়াতাড়ি অনারব অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছো কিন্তু হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) একজন সাদামাটা

---

[১] আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল-মুসনদ*, খ. ৩, পৃ. ২২৪–২২৫, হাদীস: ১৬৯৬:

عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ: ذَكَرَ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ يَبْكِيْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيْكَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ؟ فَقَالَ: نَبْكِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمًا مَا، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ وَيُفِيءُ عَلَيْهِمْ، حَتَّىٰ ذَكَرَ الشَّامَ، فَقَالَ: «إِنْ يُنْسَأْ فِيْ أَجَلِكَ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ فَحَسْبُكَ مِنَ الْخَدَمِ ثَلَاثَةٌ: خَادِمٌ يَخْدُمُكَ، وَخَادِمٌ يُسَافِرُ مَعَكَ، وَخَادِمٌ يَخْدُمُ أَهْلَكَ وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ. وَحَسْبُكَ مِنَ الدَّوَابِّ ثَلَاثَةٌ: دَابَّةٌ لِرَحْلِكَ، وَدَابَّةٌ لِثَقَلِكَ، وَدَابَّةٌ لِغُلَامِكَ «ثُمَّ هَذَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى بَيْتِي قَدِ امْتَلَأَ رَقِيْقًا، وَأَنْظُرُ إِلَىٰ مِرْبَطِيْ قَدِ امْتَلَأَ دَوَابَّ وَخَيْلًا، فَكَيْفَ أَلْقَىٰ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ، بَعْدَ هَذَا؟ وَقَدْ أَوْصَانَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ» إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَنْ لَقِيَنِي عَلَى مِثْلِ الْحَالِ الَّتِيْ فَارَقَنِيْ عَلَيْهَا.

আরব হিসেবে খলীফার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। গায়ে অতি সাধারণ আরবীয় পোশাক, উটের লাগামটিও একটি সাধারণ রশি।

খলীফা ওমর (রাযি.) তাঁর বাসস্থানে গিয়ে দেখতে পেলেন সেখানে আরও বেশি সরল-সাদাসিধে জীবনধারার চিহ্ন। অর্থাৎ একটি তলোয়ার একটি ঢাল ও উটের একটি হাওদা ছাড়া তাঁর বাড়িতে আর কিছু নেই। খলীফা বললেন, আবু উবাইদা, আপনি তো আপনার প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের ব্যবস্থা করে নিতে পারতেন।' জবাবে আবু উবাইদা বললেন, আমীরুল মুমিনীন, আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

একবার হযরত ওমর (রাযি.) উপঢৌকন হিসেবে ৪০০ দীনার ও চার হাজার দিরহাম হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি সব অর্থই সৈনিকদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। নিজের জন্য একটি পয়সাও রাখলেন না। হযরত ওমর একথা শুনে মন্তব্য করেন, 'আল-হামদুলিল্লাহ! ইসলামে এমন লোকও আছে।'

তিনি এতই বিনয়ী ছিলেন যে, সিপাহসালার হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ সৈনিকদের থেকে তাঁকে পৃথক করা যেত না। অপরিচিত কেউ তাকে সিপাহসালার বলে চিনতে পারতো না। একবার তো এক রোমান দূত এসে জিজ্ঞাসা করেই বসে, 'আপনাদের সেনাপতি কে? সৈনিকরা যখন আঙুল উঁচিয়ে তাঁকে দেখিয়ে দিল, তখন তো সে সেনাপতির অতি সাধারণ পোশাক ও অবস্থান দেখে হতভম্ব হয়ে গেল।

১০
হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাযি.)

নাম-নসব ও বংশ

নাম: সাঈদ, কুনিয়াত: আবুল আ'ওয়ার। পিতা: যায়েদ, মাতা: ফাতিমা বিনতে বা'জা। ঊর্ধ্বপুরুষ কা'ব ইবনে লুইয়ের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নসবের সাথে তাঁর নসব মিলিত হয়েছে।

হযরত সাঈদ (রাযি.)-এর পিতা যায়েদ ছিলেন জাহিলী যুগের মক্কার মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের একজন যাঁরা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই শিরক ও পৌত্তলিকতা থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখেন, সব রকম পাপাচার ও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকেন। এমন কি মুশরিকদের হাতে যবেহ করা জন্তুর গোশতও পরিহার করতেন। একবার নুবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে 'বালদাহ' উপত্যকায় রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সামনে খাবার আনা হলে তিনি খেতে অস্বীকৃতি জানান। যায়েদকে খাওয়ার অনুরোধ করা হলে তিনি অস্বীকৃতি জানিয়ে তাদেরকে বলেন, 'তোমাদের দেব-দেবীর নামে যবেহকৃত পশুর গোশত আমি খাই না।'[১]

হযরত আসমা (রাযি.) বলেন, একবার আমি যায়েদকে দেখলাম, তিনি কাবার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বলছেন, 'ওহে কুরাইশ বংশের লোকেরা! আল্লাহর কসম, আমি ছাড়া দীনে হানীফের ওপর তোমাদের মধ্যে আর কেউ নেই।'[২]

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ৪০, হাদীস: ৩৮২৬:
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحٍ، قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ الْوَحْيُ، فَقُدِّمَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ سُفْرَةٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ: إِنِّيْ لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُوْنَ عَلَىٰ أَنْصَابِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ.

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ৪০, হাদীস: ৩৮২৬:
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ ﷺ، قَالَتْ: رَأَيْتُ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَائِمًا مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُوْلُ: يَا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ، وَاللهِ مَا مِنْكُمْ عَلَىٰ دِيْنِ إِبْرَاهِيْمَ غَيْرِيْ.

জাহিলী যুগে সাধারণত কন্যাসন্তান জীবন্ত দাফন করা হতো। কোথাও কোনো কন্যা সন্তান হত্যা বা দাফন করা হচ্ছে শুনতে পেলে যায়েদ তার অভিভাবকের কাছে চলে যেতেন এবং সন্তানটিকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে নিতেন। তারপর সে বড় হলে তার পিতার কাছে নিয়ে গিয়ে বলতেন, ইচ্ছে করলে এখন তুমি নিজ দায়িত্বে নিতে পার অথবা আমার দায়িত্বে ছেড়ে দিতে পার।[১]

কুরাইশরা তাদের কোনো একটি উৎসব পালন করছে। মানুষের ভিড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়িল তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি দেখছে পুরুষেরা তাদের মাথায় বেঁধেছে দামী রেশমী পাগড়ি, গায়ে জড়িয়েছে মূল্যবান ইয়ামনী চাদর। আর নারী ও শিশুরা পরেছে মূল্যবান সাজে সুসজ্জিত করে হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে তাদের দেব-দেবীর সামনে বলি দেওয়ার জন্য।

তিনি কাবার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'কুরাইশ গোত্রের লোকেরা! এ ছাগলগুলো সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তাআলা। তিনিই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তাদের পান করান, জমিনে ঘাস সৃষ্টি করে তাদের আহার দান করেন। আর তোমরা অন্যের নামে সেগুলো যবেহ কর? আমি তোমাদেরকে একটি মূর্খ সম্প্রদায়রূপে দেখতে পাচ্ছি।'[২]

একথা শুনে তাঁর চাচা ও হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-এর পিতা আল খাত্তাব উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর গালে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিয়ে বলল, তোর সর্বনাশ হোক! সবসময় আমরা তোর মুখ থেকে এ ধরণের বাজে কথা শুনে সহ্য করে আসছি। এখন আমাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে।

---

[১] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ৪০, হাদীস: ৩৮২৬:
عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ ﷺ، قَالَتْ: ... وَكَانَ يُحْيِي الْـمَوْءُوْدَةَ، يَقُوْلُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ابْنَتَهُ، لَا تَقْتُلْهَا، أَنَا أَكْفِيْكَهَا مَئُونَتَهَا، فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لِأَبِيْهَا: إِنْ شِئْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ، وَإِنْ شِئْتَ كَفَيْتُكَ مَئُونَتَهَا.

[২] আল-বুখারী, *আস-সহীহ*, খ. ৫, পৃ. ৪০, হাদীস: ৩৮২৬:
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ، ... وَأَنَّ زَيْدَ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَعِيْبُ عَلَىٰ قُرَيْشٍ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَقُوْلُ: الشَّاةُ خَلَقَهَا اللهُ، وَأَنْزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ الْمَاءَ، وَأَنْبَتَ لَهَا مِنَ الأَرْضِ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَىٰ غَيْرِ اسْمِ اللهِ، إِنْكَارًا لِذَلِكَ وَإِعْظَامًا لَهُ.

তারপর তার গোত্রের বোকা লোকদের উত্তেজিত করে তুলল তাঁকে কষ্ট দিয়ে ত্যক্ত-বিরক্ত করে তুলতে। অবশেষে তিনি বাধ্য হলেন মক্কা ছেড়ে হিরা পর্বতে আশ্রয় নিতে। তাতেও সে ক্ষান্ত হল না। গোপনেও যাতে তিনি মক্কায় প্রবেশ করতে না পারেন, সেদিকে সর্বক্ষণ দৃষ্টি রাখার জন্য একদল কুরাইশ যুবককে সে নিয়োগ করে রাখে।

অতঃপর যায়েদ ইবনে আমর কুরাইশদের অগোচরে ওয়ারাকা ইবনে নাওফিল, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, উসমান ইবনুল হারিস এবং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর ফুফু উমাইমা বিনতু আবদুল মুত্তালিবের সাথে গোপনে মিলিত হলেন। আরববাসী যে চরম গুমরাহির মধ্যে নিমজ্জিত সে ব্যাপারে তিনি তাদের সাথে মতবিনিময় করলেন যায়েদ তাঁদেরকে বললেন, 'আল্লাহর কসম আপনার নিয়মিতভাবে জেনে রাখুন, আপনাদের এ জাতি কোনো ভিত্তির ওপর নেই। তারা দীনে ইবরাহীমকে বিকৃত করে ফেলেছে তার বিরুদ্ধাচরণ করে চলছে। আপনারা যদি মুক্তি চান, নিজেদের জন্য একটি দীন অনুসন্ধান করুন।'

অতঃপর এ চার ব্যক্তি ইহুদি, নাসারা ও অন্যান্য ধর্মের ধর্মগুরুদের নিকট গেলেন দীনে ইবরাহীম তথা দীনে হানীফ সম্পর্কে জানার জন্য। ওয়ারাকা ইবনে নাওফিল খ্রিস্ট ধর্ম অবলম্বন করলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও উসমান ইবনুল হারিস কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারলেন না। আর যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়িলের জীবনে ঘটে গেল এক চমকপ্রদ ঘটনা। আমরা সে ঘটনা তাঁর জবানেই পেশ করছি।

'আমি ইহুদি ও খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে অবগত হলাম, কিন্তু সে ধর্মে মানসিক শান্তি পাওয়ার মতো তেমন কিছু না পেয়ে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলাম। একপর্যায়ে আমি শামে (সিরিয়া) এসে উপস্থিত হলাম। আমি আগেই শুনেছিলাম সেখানে একজন রাহিব (সংসারত্যাগী ব্যক্তি) আছেন, যিনি আসমানী কিতাবে অভিজ্ঞ। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে আমার কাহিনি বিবৃত করলাম। আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'ওহে মক্কাবাসী ভাই, আমার মনে হচ্ছে আপনি দীনে ইবরাহীম অনুসন্ধান করছেন।'

বললাম, 'হ্যাঁ আমি তাই অনুসন্ধান করছি।' তিনি বললেন, 'আপনি যে দীনের সন্ধান করছেন, আজকের দিনেতো তা পাওয়া যায় না। তবে সত্য তো আপনার শহরে। আপনার কওমের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তি পাঠাবেন

যিনি দীনে ইবরাহীম পুনরুজ্জীবিত করবেন। আপনি যদি তাকে পান তাঁর অনুসরণ করবেন।' যায়েদ আবার মক্কার দিকে যাত্রা শুরু করলেন। প্রতিশ্রুত নবীকে খুঁজে বের করার জন্য দ্রুত পা চালালেন।

তিনি যখন মক্কা থেকে বেশ কিছু দূরে, তখনই আল্লাহ তাআলা নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে হিদায়ত ও সত্য দীন সহকারে পাঠালেন। কিন্তু যায়েদ তাঁর সাক্ষাৎ পেলেন না। কারণ মক্কায় পৌঁছার পূর্বেই একদল বেদুঈন ডাকাত তাঁর ওপর চড়াও হয়ে তাঁকে হত্যা করে। এভাবে তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দর্শন লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্বে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দুআ করেন,

اللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ حَرَّمْتَنِيْ مِنْ هَذَا الْخَيْرِ فَلَا تُحَرِّمْ مِنْهُ ابْنِيْ سَعِيْدًا.

'হে আল্লাহ, যদিও এ কল্যাণ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলেন, আমার পুত্র সাঈদকে তা থেকে আপনি মাহরুম করবেন না।'

ইসলাম গ্রহণ

আল্লাহ তাআলা যায়েদের এ দুআ কুবল করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) লোকদের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। প্রথম ভাগেই যাঁরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর ঈমান আনলেন তাঁদের মধ্যে সাঈদও একজন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ হযরত সাঈদ (রাযি.) প্রতিপালিত হয়েছিলেন এমন এক ঘরে, যে ঘর ঘৃণাভরে প্রতিবাদ ও প্রত্যাখ্যান করেছিল কুরাইশদের সকল কুসংস্কার ও গুমরাহিকে। তাঁর পিতা ছিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর সারাটি জীবন অতিবাহিতত করেছিলেন সত্যের সন্ধানে। হযরত সাঈদ (রাযি.) একাই ইসলাম গ্রহণ করেননি, সাথে তাঁর সহধর্মিনী ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)-এর বোন হযরত ফাতিমা বিনতুল খাত্তাব (রাযি.)ও ইসলাম গ্রহণ করেন।

ইসলাম গ্রহণের কারণে কুরাইশ বংশের এ যুবকও অন্যদের মতো যুলুম অত্যাচারের শিকার হন। কুরাইশরা তাঁকে ইসলাম থেকে ফেরানো দূরে থাক, তাঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে বরং কুরাইশদের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন ইসলামের মধ্যে। তিনি হলেন তাঁর শ্যালক হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)। তাঁদের মাধমেই আল্লাহ তাআলা হযরত ওমর (রাযি.)-কে ইসলামের মধ্যে নিয়ে আসেন।

যুদ্ধে অংশ গ্রহণ

হযরত সাঈদ (রাযি.) তার যৌবনের সকল শক্তি ব্যয় করেন ইসলামের খেদমতে। তিনি যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর বয়স বিশ বছরও অতিক্রম করেনি। একমাত্র বদর যুদ্ধ ছাড়া রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে অন্য সব যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে সিরিয়ায় থাকার কারণে তিনি বদর যুদ্ধে যোগদান করতে পারেননি। তবে বদর যুদ্ধের গণিমতের অংশ তিনি লাভ করেছিলেন। এ হিসেবে তিনি প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষভাবে বদর বাহিনীর সদস্য ছিলেন।

পারস্যের কিসরা ও রোমের কাইসারের সিংহাসন পদানত করার ব্যাপারে তিনি মুসলিম সৈন্য বাহিনীর সাথে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মুসলিমদের সাথে তাঁদের যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয় তার প্রত্যেকটিতে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। ইয়ারমুক যুদ্ধেই তিনি তাঁর বীরত্বের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন,

'ইয়ারমুকের যুদ্ধে আমরা ছিলাম ছাব্বিশ হাজার বা তার কাছাকাছি। অন্যদিকে রোমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল এক লাখ বিশ হাজার। তারা অত্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপে পর্বতের মতো অটল ভঙ্গিতে আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। তাদের অগ্রভাগে বিশপ ও পাদরি-পুরোহিতদের বিরাট এক দল। হাতে তাদের ক্রুশখচিত পতাকা, মুখে প্রার্থনাসঙ্গীত। পেছন থেকে তাদের সুরে সুর মিলাচ্ছিল বিশাল সেনাবাহিনী। তাদের সেই সম্মিলিত কণ্ঠস্বর তখন মেঘের গর্জনের মতো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছিল।

মুসলিম বাহিনী এ ভয়াবহ দৃশ্য ও তাদের বিপুল সংখ্যা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ভয়ে তাদের অন্তরও কিছুটা কেঁপে উঠলো, সেনাপতি আবু উবাইদা তখন উঠে দাঁড়ালেন এবং মুসলিম সৈন্যদের জিহাদে অনুপ্রাণিত করে এক ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহর বান্দারা। আল্লাহকে সাহায্য কর, তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন। তোমাদের পা-কে দৃঢ় করবেন।

আল্লাহর বান্দারা! ধৈর্য ধারণ কর। ধৈর্য হল কুফরী থেকে মুক্তির পথ, প্রভুর রিজামন্দী হাসিলের পথ এবং অপমান ও লজ্জার প্রতিরোধ। তোমরা তীর বর্শা শানিত করে ঢাল হাতে প্রস্তুত হয়ে যাও। অন্তরে আল্লাহর যিকর ছাড়া অন্য সব চিন্তা থেকে বিরত থাক। সময় হলে আমি তোমাদের নির্দেশ দেব ইনশাআল্লাহ।'

হযরত সাঈদ (রাযি.) বলেন, তখন মুসলিম বাহিনীর ভেতর থেকে এক ব্যক্তি বেরিয়ে এসে আবু উবাইদাকে বলল, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এ মুহূর্তে আমি আমার জীবন কুরবানি করব। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে পৌঁছে দিতে হবে এমন কোনো বাণী কি আপনার কাছে?' হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) বললেন, 'হ্যাঁ, আছে। তাঁকে আমার ও মুসলিমদের সালাম পৌঁছে দিয়ে বলবে, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের রব আমাদের সাথে যে অঙ্গীকার করেছেন, তা আমরা সত্যই পেয়েছি।'

হযরত সাঈদ (রাযি.) বলেন, 'আমি তাঁর কথা শোনা মাত্রই দেখতে পেলাম সে তার তরবারি কোষমুক্ত করে আল্লাহর শত্রুদের সাথে সংঘর্ষের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। এ অবস্থায় আমি দ্রুত মাটিতে লাফিয়ে পড়ে হাঁটুতে ভর দিয়ে অগ্রসর হলাম এবং আমার বর্শা হাতে প্রস্তুত হয়ে গেলাম। শত্রুপক্ষের প্রথম যে ঘোড় সওয়ার আমাদের দিকে এগিয়ে এলো আমি তাকে আঘাত করলাম। তারপর অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে শত্রু বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। আল্লাহ তাআলা আমার অন্তর থেকে সকল প্রকার ভয়ভীতি একেবারেই দূর করে দিলেন। অতঃপর মুসলিম বাহিনী রোমান বাহিনীর ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালাল এবং তাদেরকে পরাজিত করল।'

দিমাশক অভিযানেও হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাযি.) অংশগ্রহণ করেন। দিমাশক জয়ের পর আবু উবাইদা তাঁকে সেখানকার ওয়ালী নিযুক্ত করেন। এভাবে তিনি হলেন দিমাশকের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম ওয়ালী। কিন্তু জিহাদের প্রতি প্রবল আগ্রহের কারণে এ পদ লাভ করে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি হযরত আবু উবাইদা (রাযি.)-কে লিখলেন, 'আপনারা জিহাদ করবেন, আর আমি বঞ্চিত হবো, এমন আত্মত্যাগ ও কুরবানি আমি করতে পারিনি।' চিঠি পৌঁছার সাথে সাথে কাউকে আমার স্থলে পাঠিয়ে দিন। আমি শিঘ্রীই আপনার নিকট পৌঁছে যাচ্ছি। হযরত আবু উবাইদা (রাযি.) বাধ্য হয়ে হযরত ইয়াযিদ ইবনে আবু সুফিয়ান (রাযি.)-কে দিমাশকের ওয়ালী নিযুক্ত করলেন এবং হযরত সাঈদ (রাযি.) জিহাদের ময়দানে ফিরে গেলেন।

উমাইয়া যুগে

উমাইয়া যুগে হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাযি.)-কে কেন্দ্র করে এক আশ্চর্যময় ঘটনা ঘটে। দীর্ঘদিন ধরে মদীনাবাসীদের মুখে ঘটনাটি শোনা

যেত। ঘটনাটি হল, আরওয়া বিনতে উওয়াইস নামী এক মহিলা দুর্নাম রটাতে থাকে যে হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাযি.) তাঁর জমির একাংশ জরবদখল করে নিজ জমির সাথে মিলিয়ে নিয়েছেন। যেখানে সেখানে সে একথা বলে বেড়াতে লাগল। এক পর্যায়ে সে মদীনার ওয়ালী মারওয়ান ইবনুল হিকামের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করল। বিষয়টি যাচাই করে দেখার জন্য মারওয়ান কয়েকজন লোককে হযরত সাঈদ (রাযি.)-এর নিকট পাঠালেন। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী হযরত সাঈদের জন্য বিষয়টি ছিল বেশ কষ্টদায়ক। তিনি বললেন,

'তারা মনে করে আমি তার ওপর যুলম করছি। কিভাবে আমি যুলম করতে পারি? আমি তো রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি যুলম করে নেবে, কিয়ামতের দিন সাত তবকা যমীন তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে।' ইয়া আল্লাহ! সে ধারণা করেছে অমি তার ওপর যুলম করেছি। যদি সে মিথ্যুক হয়, তার চোখ অন্ধ করে দাও, যে কূপ নিয়ে সে আমার সাথে ঝগড়া করেছে, তার মধ্যেই তাকে নিক্ষেপ কর এবং আমার পক্ষে এমন আলোক প্রকাশ করে দাও যাতে মুসলিমদের মাঝে স্পষ্ট হয়ে যায় যে আমি তার ওপর কোনো যুলম করিনি।'

এ ঘটনার পর কিছু দিন যেতে না যেতেই আকীক উপত্যকা এমনভাবে প্লাবিত হল যে অতীতে আর কখনো তেমন হয়নি। ফলে দু'জমিনের মাঝখানে বিতর্কিত অদৃশ্য চিহ্নটি এমনভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ল যে, মুসলিমরা তা দেখে বুঝতে পারল সাঈদ সত্যবাদী। তারপর একমাস না যেতেই মহিলাটি অন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় একদিন সে তার জমিনে পায়চারী করতে করতে বিতর্কিত কূপটির মধ্যে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) বলেন, 'আমরা শুনতাম লোকেরা কাউকে অভিশাপ দিতে গেলে বলত আল্লাহ তোমাকে অন্ধ করুন যেমন অন্ধ করেছেন আরওয়াকে। এ ঘটনায় অবাক হওয়ার তেমন কিছু নেই, কারণ রাসুলুল্লাহ (সা.) তো বলেছেন, 'তোমরা মাযলুমের দুআ থেকে দূরে থাক। কারণ সেই দুআ আর আল্লাহর মাঝে কোনো প্রতিবন্ধক থাকে না।' এই যদি হয় সব মাযলুমের অবস্থা, তাহলে আশারায়ে মুবাশশারা জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ জনের একজন সাঈদ ইবনে যায়েদের মতো মাযলুমের দুআ কবুল হওয়া তেমন আর আশ্চর্য কি?

হাফিয আবু নুআইম (রহ.) বর্ণনা করেছেন,

عَنْ رَبَاحِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ الْمُغِيْرَةَ، كَانَ فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ وَعِنْدَهُ أَهْلُ الْكُوْفَةِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ يُدْعَىٰ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، فَحَيَّاهُ الْمُغِيْرَةُ وَأَجْلَسَهُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ عَلَى السَّرِيْرِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ فَاسْتَقْبَلَ الْمُغِيْرَةَ فَسَبَّ، فَقَالَ: مَنْ يَسُبُّ هَذَا يَا مُغِيْرَةُ؟ قَالَ: سَبَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ ﷺ، فَقَالَ: يَا مُغِيرَةُ بْنَ شُعْبَةَ ثَلَاثًا، أَلَا أَسْمَعُ أَصْحَابَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُسَبُّوْنَ عِنْدَكَ، لَا تُنْكِرُ وَلَا تُغَيِّرُ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ – مِمَّا سَمِعَتْ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَإِنِّيْ لَمْ أَكُنْ أَرْوِيْ عَنْهُ كَذِبًا، يَسْأَلُنِيْ عَنْهُ إِذَا لَقِيتُهُ – أَنَّهُ قَالَ: «أَبُوْ بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ فِي الْجَنَّةِ، وَتَاسِعُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ»، لَوْ شِئْتُ أَنْ أُسَمِّيَهُ لَسَمَّيْتُهُ، قَالَ: فَرَّجَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُونَهُ: يَا صَاحِبَ رَسُوْلِ اللهِ مَنِ التَّاسِعُ؟ قَالَ: نَاشَدْتُمُوْنِيْ بِاللهِ، وَاللهُ عَظِيْمٌ، أَنَا تَاسِعُ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَرَسُوْلُ اللهِ الْعَاشِرُ، ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ يَمِينًا فَقَالَ: لَمَشْهَدٌ شَهِدَهُ رَجُلٌ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُغْبَرُّ وَجْهُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ وَلَوْ عُمِّرَ عُمْرَ نُوْحٍ.

'রাবাহ ইবনুল হারিস থেকে বর্ণিত, মুগীরা ইবনে শু'বা একটি বড় মসজিদে বসে ছিলেন। তখন তাঁর ডানে বাঁয়ে বসা ছিল কুফার কিছু লোক। এমন সময় সাঈদ ইবনে যায়েদ নামক এক ব্যক্তি এলেন। মুগীরা তাকে সালাম করে খাটের ওপর পায়ের দিকে বসালেন। অতঃপর কুফাবাসী এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে মুগীরার দিকে মুখ করে গালি বর্ষণ করতে লাগল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, মুগীরা, এ লোকটি কার প্রতি গালি বর্ষণ করছে? বললেন, আলী ইবনে আবু তালিবের প্রতি। তিনি বললেন, ওহে মুগীরা! এভাবে তিনবার

ডাকলেন। তারপর বললেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবায়ে কেরামের আপনার সামনে গালি দেওয়া হবে, আর আপনি তার প্রতিবাদ করবেন না, এ আমি দেখতে চাইনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আবু বকর জান্নাতী, ওমর জান্নাতী, উসমান জান্নাতী, আলী জান্নাতী, তালহা জান্নাতী, যুবাইর জান্নাতী, আবদুর রহমান জান্নাতী, সা'দ ইবনে মালিক জান্নাতী এবং নবম এক ব্যক্তিও জান্নাতী, তোমরা চাইলে আমি তার নামটিও বলতে পারি। রাবী বলেন, লোকেরা সমস্বরে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, হে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবী, নবম ব্যক্তিটি কে? বললেন, নবম ব্যক্তিটি আমি। তারপর তিনি কসম করে বললেন, যে ব্যক্তি একটি মাত্র যুদ্ধে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তার মুখমণ্ডল ধূলি ধূসরিত হয়েছে, তার এ একটি কাজ যেকোনো ব্যক্তির জীবনের সকল সৎকর্ম অপেক্ষা উত্তম যদিও সে নূহের সমান বয়সই লাভ করুক না কেন।'[১]

ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা

তিনি ছিলেন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবায়ে কেরামের অন্যতম। সাঈদ ইবনে হাবীব বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট হযরত আবু বকর (রাযি.), হযরত ওমর (রাযি.), হযরত উসমান (রাযি.), হযরত আলী (রাযি.), হযরত সা'দ (রাযি.), হযরত সাঈদ (রাযি.), হযরত তালহা (রাযি.), হযরত যুবাইর (রাযি.) ও হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রাযি.)-এর স্থান ও ভূমিকা ছিল একই। যুদ্ধের ময়দানে তাঁরা থাকতেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আগে এবং নামাযের জামায়াতে থাকতেন তাঁর পেছনে।

হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাযি.)-এর নিকট থেকে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.), হযরত আমর ইবনে হুরাইস (রাযি.), হযরত আবুত তুফাইল (রাযি.) ও হযরত আবু উসমান আন-নাহদী (রহ.), হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.), হযরত কায়েস ইবনে আবু হাযেম (রহ.) প্রমুখ প্রখ্যাত তাবেয়ীগণও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[১] (ক) মুহাম্মদ ইউসুফ আল-কান্ধলওয়ী, *হায়াতুস সাহাবা*, খ. ৩, পৃ. ২১১; (খ) আবু নুআইম আল-আসবাহানী, *হিলয়াতুল আওলিয়া ওয়া তাবাকাতুল আসফিয়া*, আস-সাআদা, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৪ হি. = ১৯৭৪ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৯৫

ওফাত

ইমাম ওয়াকিদী বলেন, তিনি আকীক উপত্যকায় ইনতিকাল করেন এবং মদীনায় সমাহিত হন। মৃত্যুসন হিজরী ৫০ মতান্তরে হিজরী ৫১ অথবা ৫২। সত্তর বছরের ওপর তিনি জীবন লাভ করেন। হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাযি.) তাঁকে গোসল দিয়ে কাফন পরান এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.) নামাযে জানাযার ইমামতি করেন। তবে হাইসাম ইবনে আদীর মতে তিনি কুফায় ইনতিকাল করেন এবং প্রখ্যাত সাহাবী হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাযি.) তাঁর জানাযার ইমামতি করেন।

তথ্যপঞ্জি

॥আ॥

১. *আল-কুরআন আল-করীম*

২. আল-আজুর্‌রী : আবু বকর, মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন আল-আজুর্‌রী (০০০–৩৬০ হি. = ০০০–৯৭০ খ্রি.), ***আশ-শরীআ***, দারুল ওয়াতান, রিয়াদ, সউদী আরব (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.)

৩. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক: আবু আবদুর রহমান, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ইবনে ওয়াযিহ আল-হানযালী আত-তুরকী আল-মারওয়াযী (১১৮–১৮১ হি. = ৭৩৬–৭৯৭ খ্রি.), ***আয-যুহদ ওয়ার রাকায়িক***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান

৪. আবু আওয়ানা : আবু আওয়ানা, ইয়াকূব ইবনে ইসহাক ইবনে ইবরাহীম আন-নায়শাপুরী (০০০–৩১৬ হি. = ০০০–৯২৮ খ্রি.), ***আল-মুসতাখরাজ***, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওওয়ারা, সউদি আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৫ হি. = ২০১৪ খ্রি.)

৫. আবু ইয়া'লা আল-মুসিলী: আবু ইয়া'লা, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুসান্না ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে ঈসা ইবনে হিলাল আত-তামীমী আল-মুসিলী (২১১–৩০৭ হি. = ৮২৬–৯২০ খ্রি.), ***আল-মুসনদ***, দারুল মামুন লিত-তুরাস, দিমাশক, সিরিয়া (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

৬. আবু দাউদ : আবু দাউদ, সুলায়মান উবনুল আশআস ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর আল-আযদী আস-সিজিসতানী (২০২–২৭৫ হি. = ৮১৭–৮৮৯ খ্রি.), ***আস-সুনান***, আল-মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান

৭. আবু দাউদ আত-তায়ালিসী: আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনে দাউদ ইবনুল জারূদ আত-তায়ালিসী (১৩৩–২০৪ হি. = ৭৫০–৮১৯ খ্রি.), ***আল-মুসনদ***, দারু হিজরা, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.)

৮. আবু বকর আল-খাল্লাল : আবু বকর, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হারুন ইবনে ইয়াযীদ আল-খাল্লাল আল-বগদাদী (০০০–৩১১ হি. = ০০০–৯২৩ খ্রি.), ***আস-সুন্নাহ***, দারুর রায়া, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১০ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)

৯. আবু হানিফা আদ-দীনাওয়ারী: আবু হানিফা, আহমদ ইবনে দাউদ আদ-দীনাওয়ারী (০০০–২৮১ হি. = ০০০–৮৯৪ খ্রি.), ***আল-আখবারুত তিওয়াল***, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৭৯ হি. = ১৯৬০ খ্রি.)

১০. আলী আল-মুত্তাকী : আলাউদ্দীন, আলী ইবনে হুসামউদ্দীন ইবনে কাযী খান আল-কাদিরী আশ-শাযিলী আল-হিন্দী আল-বুরহানপুরী আল-মাদানী আল-মক্কী আল-মুত্তাকী (৮৮৮–৯৭৫ হি. = ১৪৮৩–১৫৬৭ খ্রি.), ***কনযুল উম্মাল ফী সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল***, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (পঞ্চম সংস্করণ: ১৪০১ হি. = ১৯৮১ খ্রি.)

১১. আহমদ ইবনে হাম্বল: আবু আবদুল্লাহ, আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ আশ-শায়বানী (১৬৪–২৪১ হি. = ৭৮০–৮৫৫ খ্রি.), ***আল-মুসনদ***, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

॥ই॥

১২. ইবনুল আসীর : ইয্‌যুদ্দীন, আবুল হাসান, আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম ইবনে আবদুল

ওয়াহিদ ইবনুল আসীর আল-জাযারী আশ-শায়বানী (৫৫৫–৬৩০ হি. = ১১৬০–১২৩৩ খ্রি.), ***আল-কামিল ফিত তারীখ***, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৭ খ্রি.)

১৩. ইবনুল আসীর : ইয্যুদ্দীন, আবুল হাসান, আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম ইবনে আবদুল ওয়াহিদ ইবনুল আসীর আল-জাযারী আশ-শায়বানী (৫৫৫–৬৩০ হি. = ১১৬০–১২৩৩ খ্রি.), ***উসুদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

১৪. ইবনে আবদুল বার্‌র: আবু উমর, ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বার্‌র আন-নামারী আল-কুরতুবী (৩৬৮–৪৬৩ হি. = ৯৮৭–১০৭১ খ্রি.), ***আল-ইসতিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব***, দারুল জীল, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.)

১৫. ইবনে আবু আসিম : আবু বকর, ইবনুন নুবায়ল, আহমদ ইবনে আমর ইবনে আবু আসিম ইবনে মাখলিদ আশ-শায়বানী (২০৬–২৮৭ হি. = ৮২২–৯০০ খ্রি.), ***আল-আহাদ ওয়াল মাসানী***, দারুর রায়া, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯১ খ্রি.)

১৬. ইবনে আসাকির : তকীউদ্দীন, আবুল কাসিম, আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে হিবাতুল্লাহ ইবনে আসাকির আদ-দিমাশকী (৪৯৯–৫৭১ হি. = ১১০৫–১১৮৬ খ্রি.), ***তারীখু মদীনাতি দামিশক ওয়া যিক্‌রু ফযলিহা ওয়া তাসমিয়াতি মিন হল্লিহা মিনাল আমাসিল আওয়িজতাযু বনূহায়হা মিন ওয়ারিদিয়হা ওয়া আহলিহা***, দারুল ফিকর, দিমাশক, সিরিয়া (১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

১৭. ইবনে ইসহাক : মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে ইয়াসার আল-মুত্তালিবী আল-মাদানী (০০০–১৫১ হি. = ০০০–৭৬৮ খ্রি.) ***আস-সিয়ার ওয়াল মাগাযী***, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৯৮ হি. = ১৯৭৮ খ্রি.)

১৮. ইবনে কসীর : আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দীন, ইসমাঈল ইবনে উমর ইবনে কাসীর আল-কুরাশী (৭০১–৭৭৪ হি. = ১৩০২–১৩৭৩ খ্রি.), ***আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া***, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

১৯. ইবনে খালদুন : আবু যায়দ, অলীউদ্দীন, আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খলদুন আল-খাযরমী আল-ইশবীলী (৭৩২–৮০৮ হি. = ১৩৩২–১৪০৬ খ্রি.), ***দীওয়ানুল মুবতাদা ওয়াল খবর ফী তারীখিল আরব ওয়াল বারবার ওয়া মিন আসিরিহিম মিন যাওয়ীশ শানিল আকবর = তারীখু ইবনি খালদুন***, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

২০. ইবনে জামাআ : আবু আবদুল্লাহ, বদরুদ্দীন, মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে সা'দুল্লাহ ইবনে জামাআ আল-কিনানী আল-হামওয়ী আশ-শাফিয়ী (৬৩৯–৭৩৩ হি. = ১২৪১–১৩৩৩ খ্রি.): ***আল-মানহালুর রাওয়ী ফী মুখতাসারি উলূমিল হাদীস আন-নাওয়াওয়ী***, দারুল ফিকর, দিমাশক, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

২১. ইবনে তায়মিয়া : শায়খুল ইসলাম, তকী উদ্দীন, আবুল আব্বাস, আহমদ ইবনে আবদুল হালীম ইবনে আবদুস সালাম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে তায়মিয়া আল-হারানী আল-হাম্বলী আদ-দিমাশকী

(৬৬১–৭২৮ হি. = ১২৬৩–১৩২৮ খ্রি.), ***মজমূ'উল ফাতাওয়া***, বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স, মদীনা শরীফ, সউদী আরব (১৪১৬ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

২২. ইবনে বাত্তাহ আল-উকবারী: আবু আবদুল্লাহ, ওবাইদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদান, ইবনে বাত্তাহ আল-উকবারী (৩০৪–৩৮৭ হি. = ৯১৭–৯৯৭ খ্রি.), ***আল-ইবানাতুল কুবরা = আল-ইবানাতু আন শারীয়াতিল ফিরকাতিন নাজিয়া ওয়া মুজানাবাতিল ফিরাকিল মাযমূমা***, দারুর রায়া, রিয়াদ, সউদি আরব (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

২৩. ইবনে রশীক আল-কায়রাওয়ানী: আবু আলী আল-হুসাইন ইবনে রশীক আল-কায়রাওয়ানী (৩৯০–৪৬৩ হি. = ১০০০–১০৭১ খ্রি.), ***আল-উমদা ফী মাহাসিনিশ শি'র ওয়া আদাবিহি***, দারুল জীল, বয়রুত, লেবনান (পঞ্চম সংস্করণ: ১৪০১ হি. = ১৯৮১ খ্রি.)

২৪. ইবনে মাজাহ : ইবনে মাজাহ, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ আর-রুবায়ী আল-কাযওয়ীনী (২০৯–২৭৩ হি. = ৮২৪–৮৮৭ খ্রি.), ***আস-সুনান***, দারু ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, বয়রুত, লেবনান

২৫. ইবনে শাহীন : আবু হাফস, উমর ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে আযদায আল-বগদাদী ইবনে শাহীন (২৯৭–৩৮৫ হি. = ৯০৯–৯৯৫ খ্রি.), ***শারহু মাযাহিবি আহলিস সুন্নাহ ওয়া মা'রিফাতু শারায়িয়িদ্দীন ওয়াত তামাস্সুকু বিস সুনান***, মুওয়াস্সাসাতু কুরতুবা লিন-নাশরি ওয়াত তাওযী', কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯১৫ খ্রি.)

২৬. ইবনে সা'দ : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে সা'দ ইবনে মানী' আয-যুহরী আল-হাশিমী আল-বাসারী আল-বগদাদী (১৬৮–২৩০ হি. = ৭৮৪–৮৪৫ খ্রি.), ***আত-তাবাকাতুল কুবরা***, মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

২৭. ইবনে হাজর আল-আসকলানী: আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩–৮২৫ হি. = ১৩৭৪–১৪৪৯ খ্রি.), ***ফাতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী***, দারুল মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. = ১৯৫৯ খ্রি.)

২৮. ইবনে হাজর আল-আসকলানী: আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩–৮২৫ হি. = ১৩৭৪–১৪৪৯ খ্রি.), ***আল-ইসাবা ফী তামীযিস সাহাবা***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

২৯. ইবনে হাজর আল-আসকলানী: আবুল ফযল, আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাজর আল-আসকলানী (৭৭৩–৮২৫ হি. = ১৩৭৪–১৪৪৯ খ্রি.), ***তাহযীবুত তাহযীব***, দায়িরাতুল মাআরিফ আন-নিযামিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত (প্রথম সংস্করণ: ১৩২৬ হি. = ১৯০৮ খ্রি.)

৩০. ইবনে হাযম : আলী ইবনে আহমদ ইবনে সাঈদ ইবন হাযম আল-উনদুলুসী আয-যাহিরী (৩৮৪–৪৫৬ হি. = ৯৯৫–১০৬৩ খ্রি.), ***আল-ফাসাল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল***, মাকতাবাতুল খানজী, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৩১৭ হি. = ১৯০০ খ্রি.)

৩১. ইবনে হিব্বান : আবু হাতিম, মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমদ ইবনে মুআয ইবনে মা'বদ আত-তায়মী আদ-দারিমী আল-বসতী (০০০–৩৫৪ হি. = ০০০–৯৬৫ খ্রি.), ***আস-সহীহ = আল-ইহসান ফী তকরীবি সহীহ ইবনি হিব্বান***, মুআস্‌সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৩২. ইবনে হিশাম : আবু মুহাম্মদ, জামাল উদ্দীন, আবদুল মালিক ইবনে হিশাম ইবনে আইয়ুব আল-হুমায়রী আল-মাআফিরী (০০০–২১৩ হি. = ০০০–৮২৮ খ্রি) ***আস-সীরাতুন নাবাওয়ীয়া***, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৭৫ হি. = ১৯৫৫ খ্রি.)

৩৩. আল-ইয়াকুবী : আহমদ ইবনে আবু ইয়াকুব ইসহাক ইবনে জা'ফর ইবনে ওয়াহাব ইবনে ওয়াযিহ আল-ইয়াকুবী (০০০–২৯২-এর হি. = ০০০–৯০৫-এর খ্রি.), ***তারীখুল ইয়াকুবী***, দারু সাদির, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৬৬ হি. = ১৯৬৮ খ্রি.)

॥উ॥

৩৪. আল-উকায়লী : আবু জা'ফর, মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে মুসা ইবনে হাম্মাদ আল-উকায়লী আল-মক্কী (০০০–২২৩ হি. = ০০০–৯৩৪ খ্রি.), ***আয-যু'আফউল কবীর***, দারুল মাকতাবা আল-ইলমিয়া, বয়রুত, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪ হি. = ১৯৮৪ খ্রি.)

॥ও॥

৩৫. প্রফেসর ড. ওমর ফাররুখ : প্রফেসর ডক্টর, ওমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ফাখরুখ (১৩২৪–১৪০৮ হি. = ১৯০৬–১৯৮৭ খ্রি.), ***তারীখুল আদাব আল-আরাবী***, দারুল ইলম লিল মালায়ীয়ীন, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৩৮৯ হি. = ১৯৬৯ খ্রি.)

॥ক॥

৩৬. আল-কাস্‌তাল্লানী : আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আবদুল মালিক আল-কাস্‌তাল্লানী আল-মিসরী (৮৫১–৯২৩ হি. = ১৪৪৮–১৫১৭ খ্রি.), ***আল-মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল-মানহিল মুহাম্মাদিয়া***, আল-মাকতাবা আত-তাওফীকিয়া, কায়রো, মিসর

৩৭. আল-কুযায়ী : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে সালামা ইবনে জা'ফর ইবনে আলী ইবনে হাকমূন আল-কুযায়ী আল-মিসরী (০০০–৪৫৪ হি. = ০০০–১০৬২ খ্রি), ***'উয়ূনুল মা'আরিফ ওয়া ফুনূনু আখবারিল খালায়িফ = তারিখুল কুযায়ী***, উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, মক্কা মুকার্‌রামা, সাউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)

॥খ॥

৩৮. আল-খতীবুল বগদাদী : আল-খতীবুল বগদাদী, আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২–৪৬৩ হি. = ১০০২–১০৭২ খ্রি.), ***আল-কিফায়া ফী মা'রিফাতি উসূলি 'ইলমির রিওয়ায়া***, মাকতাবাতুল ইলমিয়া, মদীনা মুনাওওয়ারা, সউদী আরব

৩৯. আল-খতীবুল বগদাদী : আল-খতীবুল বগদাদী, আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২–৪৬৩ হি. = ১০০২–১০৭২ খ্রি.), ***আল-জামি' লি-আখলাকির রাওয়ী ওয়া আদাবিস সামি'***, মাকতাবতুল মা'আরিফ, রিয়াদ, সউদী আরব

৪০. আল-খতীবুল বগদাদী : আল-খতীবুল বগদাদী, আবু বকর, আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত ইবনে আহমদ ইবনে মাহদী আল-বগদাদী (৩৯২–৪৬৩ হি. = ১০০২–১০৭২ খ্রি.), ***আল-ফকীহ ওয়াল মুত্তাফাকিহ***, দারু ইবনিল জাওযী, রিয়াদ, সউদী আরব (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২১ হি. = ২০০০ খ্রি.)

॥জ॥

৪১. আল-জাহিয : আবু ওসমান, আমর ইবনে বাহর ইবনে মাহবুব আল-কিনানী আল-লায়সী আল-জাহিয (১৬৩–২৫৫ হি. = ৭৮০–৮৬৯ খ্রি.), ***আল-বায়ান ওয়াত তাবয়ীন***, দারু ওয়া মাকতাবাতু হিলাল, বয়রুত, লেবনান (১৪২৩ হি. = ২০০২)

॥ত॥

৪২. আত-তাবারানী : আবুল কাসিম, সুলায়মান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ুব ইবনে মতীর আল-লাখমী আশ-শামী আত-তাবারানী (২৬০–৩৬০ হি. = ৮৭৩–৯৭১ খ্রি.), ***আল-মু'জামুল কবীর***, মাকতাবাতু ইবনে তায়মিয়া, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৪ খ্রি.)

৪৩. আত-তাবরীযী : আবু আবদুল্লাহ, ওয়ালি উদ্দিন, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল-খতীব আল-উমরী আত-তাবরীযী (০০০–৭৪১ হি. = ০০০–১৩৪০ খ্রি.), ***মিশকাতুল মাসাবীহ***, আল-মাকতাবুল ইসলামী, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৫ = ১৯৮৫ খ্রি.)

৪৪. আত-তাবারী : আবু জা'ফর, মুহাম্মদ ইবনে জরীর ইবনে ইয়াযীদ ইবনে গালিব আত-তাবারী (২২৪–৩১০ হি. = ৮৩৯–৯২৩ খ্রি.), ***তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক = তারীখুত তাবারী***, দারুত

তুরাস, বয়রুত, লেবনান (১৩৮৭ হি. = ১৯৬৭ খ্রি.)

৪৫. ড. তাহা হুসাইন : ড. তাহা হুসাইন ইবনে আলী ইবনে সালামা (১৩০৭–১৩৯৩ হি. = ১৮৮৯–১৯৭৩ খ্রি.), ***আল-ফিতনাতুল কুবরা***, মুওয়াস্‌সাতু হিনদাওয়ী লিত-তা'লীম ওয়াস সাকাফা, কায়রো, মিসর (প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৪ হি. = ২০১৩ খ্রি.)

৪৬. আত-তিরমিযী : মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে সাওরা ইবনে মুসা ইবনুয যাহ্‌হাক আস-সুলামী আয-যরীর আল-বুগী আত-তিরমিযী (২০৯-২৭৯ হি. = ৮২৪–৮৯২ খ্রি.), ***আল-জামি'উল কবীর = আস-সুনান***, মুস্তফা আলবাবী অ্যান্ড সন্স পাবলিশিং অ্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, মিসর (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৩৯৫ হি. = ১৯৭৫ খ্রি.)

॥দ॥

৪৭. আদ-দায়লামী : আবু শুযা', শীরাওয়ায়হি শাহারদার ইবনে শীরাওয়ায়হি ইবনে ফানাখসরূ আদ-দায়লামী আল-হামদানী (৪৪৫–৫০৯ হি. = ১০৫৩–১১১৫ খ্রি.), ***আল-ফিরদাউসু বি-মাসূরিল খিতাব = মুসনদুল ফিরদাউস***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

॥ন॥

৪৮. আন-নাওয়াওয়ী : আবু যাকারিয়া, মুহউদ্দীন, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ ইবনে মুর্‌রী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হিযাম ইবনুল হিযামী আল-হাওরানী আশ-শাফিয়ী (৬৩১–৬৭৬ হি. = ১২৩৪–১২৭৮ খ্রি.), ***আত-তাকরীব ওয়াত তায়সীর লি-মা'রিফাতি সুনানিল বশীর আন-নযীর ফী উসূলিল হাদীস***, দারুল কিতাব আল-আরাবী, বয়রুত, লেবনান (নতুন সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

॥ব॥

৪৯. আল-বালাযূরী : আহমদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে জাবির ইবনে দাউদ আল-বালাযূরী (০০০–২৭৯ হি. = ০০০–৮৯২ খ্রি) ***ফুতূহুল বুলদান***, দারু ওয়া মাকতাবাতুল হিলাল, বয়রুত, লেবনান (১৪০৯ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৫০. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি. = ৯৯৪–১০৬৬ খ্রি.), ***আল-মাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা***, দারুল খুলাফা লিল-কুতুবিল ইসলামিয়া, কুয়েত

৫১. আল-বায়হাকী : আবু বকর, আহমদ ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে মুসা আল-আল-খুসরাজিরদী আল-খুরাসানী আল-বায়হাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি. = ৯৯৪–১০৬৬ খ্রি.), ***দালায়িলুন নুবুওয়াত ওয়া মারিফাতু আহওয়ালি সাহিবিশ শরীয়ত***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)

৫২. আল-বুখারী : হিবরুল ইসলাম, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনুল মুগীরা আল-বুখারী (১৯৪–২৫৬ হি. = ৮১০–৮৭০ খ্রি.), ***আল-জামিউল মুসনদ আস-সহীহ আল-মুখতাসার মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়ামিহি = আস-সহীহ***, দারু তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.)

॥ম॥

৫৩. আল-মাসউদী : আবুল হাসান, আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী আল-মাসউদী (০০০–৩৪৬ হি. = ০০০–৯৫৭ খ্রি.), ***মুরাওয়াজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহর***, দারুল হিজরা, কুম, ইরান (১৪০৯ হি. = ১৯৮৯ খ্রি.)

৫৪. মুসলিম : আবুল হাসান, মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ইবনে মুসলিম আল-কুরায়শী আন-নায়শাপুরী (২০৪–২৬১ হি. = ৮২০–৮৭৫ খ্রি.), ***আল-মুসনদুস সহীহিল মুখতাসার বি-নাকলিল আদলি আনিল আদলি ইলা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম = আস-সহীহ***, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান

৫৫. মুহাম্মদ আল-খিযরী বেগ : মুহাম্মদ ইবনে আফীফী আল-বাজূরী = শায়খ আল-খিজরী বেগ (১২৮৯–১৩৪৫ হি. = ১৮৭২–১৯২৭ খ্রি.), ***মুহাযারাতু তারিখিল উম্মাহ আল-ইসলামিয়া: আদ-দাওলাতুল উমাউবিয়া***, দারুল কলম, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪০৬ হি. = ১৯৮৬ খ্রি.)

৫৬. মুহাম্মদ ইউসুফ আল-কান্ধলওয়ী: মুহাম্মদ ইউসুফ ইবনে মুহাম্মদ ইলয়াস ইবনে মুহাম্মদ ইসমাঈল আল-কান্ধলওয়ী (১৩৩৫–১৩৮৪ হি. = ১৯১৭–১৯৬৫ খ্রি.), ***হায়াতুস সাহাবা***, মুআস্‌সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান (১৪২০ হি. = ১৯৯৯ খ্রি.)

৫৭. মুহাম্মদ রিযা : ইমাম, হাফিয, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শায়বানী (০০০–১৩৬৯ হি. = ০০০–১৯৫০ খ্রি.), ***যিন নুরাইন উসমান ইবনু আফফান আল-খলীফাতুস সালিস***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০২ হি. = ১৯৮২ খ্রি.)

॥য॥

৫৮. আয-যাহাবী : শামসুদ্দীন, আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান ইবনে কায়মায আয-যাহাবী আত-তুরকমানী আদ-দিমাশকী (৬৭৩–৭৪৮ হি. = ১২৭৫–১৩৪৭ খ্রি.), ***তাযকিরাতুল হুফ্‌ফায = তাবকাতুল***

হুফ্ফায, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হি. = ১৯৯৮ খ্রি.)

৫৯. আয-যুরকানী : আবু আবদিল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল বাকী ইবনে ইউসুফ ইবনে আহমদ ইবনে শাহাবউদ্দীন ইবনে মুহাম্মদ আয-যুরকানী (৮৫১–৯২৩ হি. = ১৪৪৮–১৫১৭ খ্রি.), ***শরহুল মাওয়াহিবুল লুদুনিয়া বিল মানহিল মুহাম্মাদিয়া***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ খ্রি.)

॥শ॥

৬০. শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী: মাওলানা, শাহ মুঈনুদ্দীন আহমদ নদবী, ***সিয়ারুস সাহাবা রাযিয়াল্লাহু আনহুম***, দারুল ইশা'আত, করাচি, পাকিস্তান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

॥স॥

৬১. আস-সুয়ুতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯–৯১১ হি. = ১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.), ***তারীখুল খুলাফা***, মাকতাবাতু নিযার মুস্তাফা আল-বায, মক্কা মুকার্‌রমা, সউদী আরব (প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫ হি. = ২০০৪ খ্রি.)

৬২. আস-সুয়ুতী : জালাল উদ্দীন, আবুল ফযল, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর আস-সুয়ুতী (৮৪৯–৯১১ হি. = ১৪৪৫–১৫০৫ খ্রি.), ***তাদরীবুর রাওয়ী ফী শরহি তাকরীবিন নাওয়াবী***, দারুল তাইয়িবা, রিয়াদ, সউদী আরব (নতুন সংস্করণ: ১৪০৫ হি. = ১৯৮৫ খ্রি.)

॥হ॥

৬৩. আল-হাকিম : আবু আবদুল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল-াহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হামদাওয়ীয়া ইবনে

নু'আইম ইবনুল হাকাম আল-হাকিম (৩২১–৪০৫ হি. = ৯৩৩–১০১৪ খ্রি.), ***আল-মুসতাদরাক আলাস সহীহাঈন***, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. = ১৯৯০ খ্রি.)